ভূতচতুর্দশী

১৪টি সেরা ভূতের গল্পের সংকলন

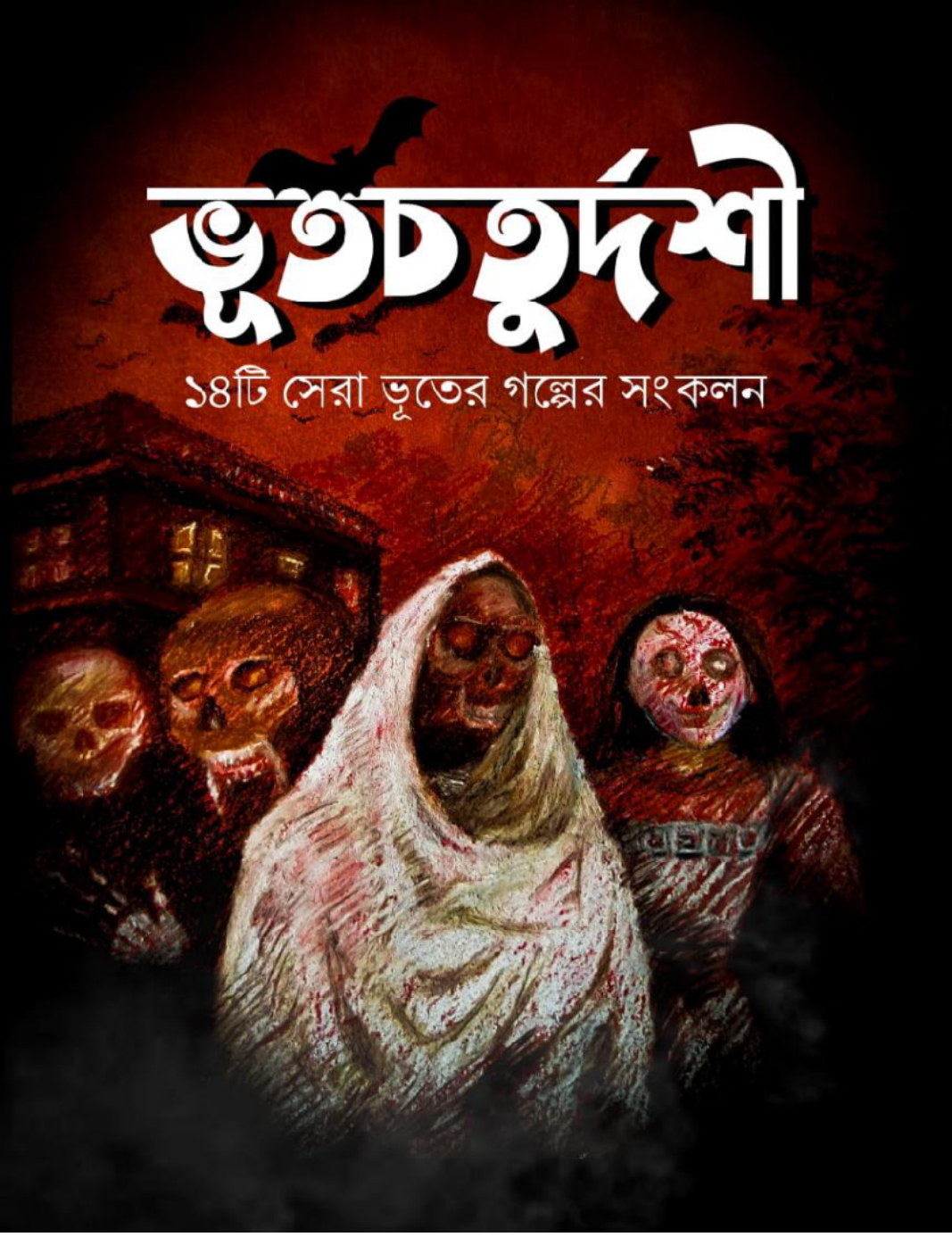

ভূতচতুর্দশী

১৪টি সেরা ভূতের গল্পের সংকলন

সম্পাদক
শুভম ভট্টাচার্য্য (তোমার বই) ও মৃনাল চক্রবর্তী
(ইনবক্স অফিসিয়াল)
সহ সম্পাদক
অভিজিৎ রায় ও তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ শিল্পী
রক্তিম মণ্ডল

পরিবেশক
তোমার বই ও ইনবক্স অফিসিয়াল

আরো বই সংগ্রহ করুন

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল ॥ বাংলা লাইব্রেরী

বাংলা ইবুক লাইব্রেরী একটি টেলিগ্রাম ভিত্তিক ইন্টারনেটে সহজলভ্য বইয়ের সংগ্রহশালা। এখানে দেয়া সকল বই ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত। আমরা নতুন করে কোন ধরনের বইয়ের ডিজিটাল ভার্শন বানাই না। কারো কপিরাইট লঙ্ঘনের কোনরুপ অভিপ্রায় আমাদের নেই। আমরা নতুন বই কিনে পড়ার সুপারিশ করি।

Bhutchoturdoshi
Edited by Subham Bhattacharjee, Mrinal Chakraborty, Abhijit Roy & Tuhin Bandopadhaya
প্রথম প্রকাশ ২০২০
পরিবেশক
তোমার বই ও ইনবক্স অফিসিয়াল
গ্রন্থস্বত্বঃ পরিবেশক
প্রচ্ছদঃ রক্তিম

উৎসর্গ

কবি অন্তরা চ্যাটার্জী

ভুমিকা

"ভূত কেমন হয়?" আজকের দিনে এই প্রশ্নটি কাওকে করলে হাসি বই অন্য কিছু আসবে না। ভূত জিনিসটি যাই হোক না কেনো তাঁর প্রতি মানুষের অবেচেতনের ভয় অনেক কমে গেছে। তাই আজকের দিনে যদি কেউ নিজের ভৌতিক অভিজ্ঞতা শোনাতে যায়, তাকে বিশেষ ছোট করা হয় সমাজের মানুষের সামনে।

কিন্তু এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও গল্পপ্রেমীদের কাছে ভুত এক আলাদা বস্তু। এখনো ভূতের গল্প পেলে ৮ থেকে ৮০ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পরে। জনমদিনের হাজারো উপহারের মাঝে ভূতের গল্পের বইতি এখনো চোখ আকর্ষন করে মানুষের। আর সেই কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই প্রয়াস।

কোন বিখ্যাত লেখক লেখিকা নন। সারা সোসাল মিডিয়া খুঁজে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের দুর্দান্ত গল্পগুলিকে এই বইতে তুলে ধরলাম। আসলে এতে আমার দুই কাজ হলো। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যে লেখক লেখিকারা নিজের গল্প ছাপা অক্ষরে দেখতে পাননা, তাদের সুযোগ করে দেওয়া। আর দুর্দান্ত লেখা গুলি দিয়ে পাঠকের মন জয় করা। এখানে যতজন লেখক আছেন ও তাদের লেখা দিয়েছেন, আমার বিশ্বাস তাদের কেউই কম যান না। কারন অনেক গল্পের মধ্যে মাত্র ১৪ টি গল্প বাছাইয়ের সময় বেশ বেগ পেতে হয়েছে সম্পাদক দের।

তবে গল্পগুলি পড়ে পাঠক যদি তাদের প্রতিক্রিয়া

আমাদের জানান। তাতে আমরা খুব খুশি হব ও আরো নতুন কাজ করার আগ্রহ পাব।

ধন্যবাদান্তে,
শুভম ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

> সুচিপত্র <

অভিশপ্ত তলোয়ার :- পার্থ সারথি পরামানিক ১
নিতাই :- তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
C/O স্যার :- আবীর রায়চৌধুরী ১৯
নীলাক্ষী লজ :- রাজেশ চ্যাটার্জী ২৮
ও কার হাসি :- পিয়ালী রায় ৩৩
পরিনতি :- মৃন্ময় চ্যাটার্জী ৩৬
ভিত রহস্য :- অমিত কুমার সাহা ৪৬
অচেনা বন্ধুত্ব :- রিঙ্কি হালদার ৪৯
নিদ্রাহীন রাত :- শুভম ভট্টাচার্য্য ৫৫
প্রতিশ্রুতি :- মৃনাল চক্রবর্তী ৫৮
ডাক :- অমৃতা ব্রহ্ম ৬৪
আমাবস্যার রাত :- সুচন্দ্রা চক্রবর্তী ৬৬
লকেটের খোঁজ :- শ্রীতম রায় ৭১
কবরবন্দী ইতিহাস :- পৌলমী গাঙ্গোপাধ্যায় ৭৫

অভিশপ্ত তলোয়ার

পার্থ সারথি পরামানিক

তলোয়ারটা বারবার হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন অজিতবাবু । স্ফটিকের মতো ঝকঝকে ফলা – মনে হয় যেন অনায়াসে এক কোপে আস্ত একটা মহিষের মাথা খুচ করে কেটে ধড় থেকে নামিয়ে দিতে পারে । হাতলটা মসৃণ কোন ধাতু দিয়ে মোড়া আর স্থানে স্থানে নানা রঙের চকচকে ছোট ছোট পাথর বসানো এবং ইসলামি যুগের কারুকার্য করা । খাপটাও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর । প্রচুর রত্ন বসানো আর একইরকম কারুকার্য করা । তলোয়ারটা দেখেই চোখ চিকচিক করে ওঠে অজিতবাবুর । "কোথা থেকে কিনলেন এটা ? এ তো দুষ্প্রাপ্য জিনিষ মশাই ।"
"দিল্লী থেকে । তবে দুষ্প্রাপ্য কি না তা আমি ঠিক বলতে পারবো না । তাই তো আপনাকে দেখালুম । আমায় বলে কিনা এটা মুঘল যুগের তলোয়ার ! .."
চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন প্রশান্তবাবু।
"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে হে । যে ধরণের কারুকার্য দেখছি তা তো মুঘল যুগের বলেই ঠাওর হচ্ছে। তবে ফলাটা দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয় – এত বছর

আগের অথচ এমন দাগহীন, মরচেহীন, ঝকঝকে আছে যেন এখনও নিত্য ব্যবহৃত হয় এই তলোয়ার ।"
"ও হয়তো বেচার জন্য ওরাই পালিশ–টালিশ করে রেখেছে ।"
"হবে হয়তো । তা আপনি এটা পেলেন কোথায় ?"
"গত সপ্তাহে দিল্লি গেছিলুম । ওখানেই একটা অনামী অ্যান্টিক শপ থেকে । বলে কিনা এটা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তলোয়ার ! যুবক ঔরঙ্গজেব নাকি তাঁর এক সৈনিককে এই তলোয়ারটা দিয়ে বলেছিলেন বন্দী দারা শিকোর মস্তক ছিন্ন করে পিতা শাহজাহানকে ভেট দিতে । ...এই সেই তলোয়ার যা দিয়ে কাটা হয়েছিল দারা শিকোর মস্তক ।"
"বলেন কি !!"
"আরও শুনুন । যদিও এর সত্যাসত্য আমি জানি না, তবে গল্পটা বেশ । এই তলোয়ারটা ঔরঙ্গজেব সেই সৈনিককেই পুরস্কার সরূপ প্রদান করেন । দারা শিকো খুবই ধর্মপরায়ণ ছিলেন । হিন্দু ধর্ম ও মুসলিম ধর্মের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন তিনি । তিনি নাকি গীতা, উপনিষদ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা শুরুও করেছিলেন । এ হেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের রক্ত পান করে এই তলোয়ারটা নাকি অভিশপ্ত হয়ে

পড়ে আর সেই সৈনিকটাও কেমন উন্মাদ হয়ে যান । পরে তিনি আবার তাঁর এক আত্মীয়কে তলোয়ারটা দিয়ে দেন । এবং শোনা যায় তারপরেই কোনও অজানা কারণে সেই ব্যক্তি ওই তলোয়ার দিয়েই বাড়ির সকলকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন । তারপর থেকে আর ওই তলোয়ারের কোনও খোঁজ ছিল না । গত মাসে এক মুসলিম ছোকরা দাবী করে তাদের বাড়িতে একটা টিনের বাক্সে বহু বছর ধরে কিছু পুরনো জিনিসের সাথে এটাও পড়ে ছিল । তাদের বংশের কেউ ওই সৈনিক বা রাজপরিবারের সাথে যুক্ত কিনা বা কিভাবে তাদের কাছে ওই তলোয়ারটি পৌঁছাল তার সদুত্তর সে দিতে পারে নি । তবে তলোয়ারের সাথে উর্দুতে লেখা একটা পুরনো চিঠি পাওয়া গেছে যাতে বোঝা যায় এটা সেই অভিশপ্ত তলোয়ার ! ভয়ে কেউ ওটি ছুত না । ছেলেটি অবশ্য এতো কিছু জানত না । তার খুব অর্থের প্রয়োজন, দাদু হাসপাতালে ভর্তি । তাই ওই অ্যান্টিক শপে গিয়ে তলোয়ারটা বিক্রি করে দেয় । কিন্তু এই সব কারনেই তলোয়ারটা কেউ কিনতে চাইছিল না, অনেকে আবার এই সব গালগল্প বিশ্বাস করতেও চায় নি । এই সময় আমি পৌঁছাই । তুমি তো জান, ইতিহাস নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই ।

আমার যথেচ্ছ টাকা আছে তাই এই সব আমি কিনি – ঘরে সাজাই । আপনাদের দেখাই তাতেই আমার আনন্দ । আর এই তলোয়ারটা আমার বেশ লেগেছে । দেখুন বার করে, হাতলটা একবার ধরে দেখুন ।"

"না, না তাহলে কাজটা আপনি মোটেও ভালো করেন নি ।"

"এই এতো বড় বাড়িতে একা থাকি । ছেলে-মেয়ে তো বিদেশে । ওই জনাকয়েক চাকর-বাকর আছে এই যা । দিন দিন যা চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়ছে তাতে আমার শখের অ্যান্টিক পিসগুলো আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব বলা যায় না । তাই এই রকম একটা অস্ত্র হাতের কাছে থাকাটা মন্দ কি !" বলে হাসতে লাগলেন প্রশান্তবাবু ।

অজিতবাবু তলোয়ারটা ময়ান থেকে বার করে এক নিমিষে বেশ কায়দা করে তুলে ধরলেন ।

"আপনি তো দেখছি অসি চালনায় বেশ পারদর্শী, মশাই !"

অজিতবাবু কোনও কিছু উত্তর না দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে বার কয়েক শূন্যে তলোয়ারটা ঘুরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন প্রশান্তবাবুর দিকে । প্রশান্তবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই অজিতবাবু

তলোয়ার উঁচু করলেন আর এক কোপ বসাতে গেলেন প্রশান্তবাবুর ঘাড়ে । প্রশান্তবাবু প্রাণ বাঁচাতে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়লেন ।
অজিতবাবু সাথে সাথে হো হো করে হেসে উঠলেন । "কোন উজবুকে আপনাকে কি বুঝিয়ে দিল আর আপনিও সেটা বিশ্বাস করে নিলেন । ধন্যি মশাই আপনি ! এই তলোয়ারটা খুব সুন্দর এবং মনোহারী... এবং খুব সম্ভবত মুঘল আমলেরই কিন্তু তা বলে এটা সেই তলোয়ার যা দিয়ে শাহজাদা দারা শিকোর মস্তক কাটা হয়েছিল তা মানতে পারলুম না । আজ চলি । সাবধানে থাকবেন আর এসব নিয়ে একদম বেশি ভাববেন না ।"

***

দিন কয়েক পর । রাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল প্রশান্তবাবুর, কানে এলো একসাথে অনেক জনের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ । তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, না, স্বপ্ন নয় – তখনও কানে আসছে চাপা কান্নার আওয়াজ । কান্নাটা এ ঘর থেকেই আসছে কিন্তু খুব ক্ষীণ ভাবে । প্রশান্তবাবু কিছু খুঁজে পেলেন না । তিনি আবার শুয়ে পড়লেন । এরকম পরপর দু'তিন

দিন ঘটল । প্রশান্তবাবু ভাবলেন কেউ নিশ্চয় তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে । তাই তিনি তলোয়ারটা শো-কেস থেকে বার করে হাতের কাছে একটা টেবিলের উপর রাখলেন ।

রাত তখন বারটা হবে । অমাবস্যার রাত, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার । হঠাৎ প্রশান্তবাবুর কানে এলো সেই একই রকম কান্নার শব্দ । তিনি বিছানায় উঠে বসলেন তখনও কানে আসছে সেই চাপা কান্নার আওয়াজ । এবার যেন অনেক সামনে থেকে । তিনি টেবিলের উপর রাখা তলোয়ারটা ধরলেন তারপর এক নিমিষে ময়ান থেকে নগ্ন তলোয়ারটা বার করলেন । সাথে সাথে যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল তার সারা শরীরে । তিনি কেমন বিভোর হয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন । কে যেন তাঁকে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল "রক্ত দাও । আমায় রক্ত দাও । বহু দিন আমি রক্ত পান করি নি ।"
প্রশান্তবাবু একইরকম ভাবে চলতে লাগলেন । বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, পোষা কুকুরটা সিঁড়ির এককোনে শুয়ে রয়েছে । প্রশান্তবাবু তার কাছে যেতেই সে কুঁই কুঁই করতে লাগলো । প্রশান্তবাবুর মাথায় তখন আগুন

জ্বলছে আর তাঁর কানে জোরে জোরে বাজছে এক নির্মম আকুতি "দাও... আমায় রক্ত দাও ... বহু দিন আমি রক্ত পান করি নি" ।
প্রশান্তবাবু যন্ত্রচালিতের মতো তলোয়ারের এক কোপ বসালেন, সাথে সাথে কুকুরটার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল । আর তারপরেই একটা পরিতৃপ্তির শব্দ এল তাঁর কানে "আঃ ..." । মুণ্ডহীন দেহটা খানিকক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে পড়ল ।
তারপর হঠাৎ যেমন শুরু হয়ে ছিল তেমনি বন্ধ হয়ে গেল সেই সমবেত ক্রন্দন ... সেই আকুতি ।
প্রশান্তবাবু আবার ঘরে গিয়ে তলোয়ারটা আগের মতোই ময়ানের ভিতর ভরে দিয়ে শুয়ে পড়লেন ।

***

চাকরদের সমবেত চিৎকারে সকাল বেলায় ঘুম ভাঙল প্রশান্তবাবুর । উঠে দেখলেন পোষা কুকুরটাকে কে যেন তলোয়ারের এক কোপে দু'টুকরো করে দিয়েছে । তিনি জোর দিয়ে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সেই কান্নার শব্দ শুনে জেগে যাওয়ার পর ঠিক কি ঘটেছিল আর মনে করতে পারলেন না । যেটা

আন্দাজ করছেন সেটা আদৌ সত্যি ছিল, নাকি স্বপ্ন ছিল তাও ঠাওর করতে পারলেন না । তবু সন্দেহ যে ওই তলোয়ারের দিকেই যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । প্রশান্তবাবু ছুটে গেলেন টেবিলটার কাছে । তারপর তলোয়ারটা খাপ থেকে বার করে জানালা দিয়ে আসা রোদের উপর ধরলেন । স্ফটিকের মতো ফলাটা রোদে ঝলমল করে উঠল । কিন্তু তাতে এক ফোঁটা রক্তের কোনও দাগ নেই । তাহলে কে এবং কি দিয়ে হত্যা করল ওই অবলা প্রানীটাকে ! আর কেনই বা করল ! কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না তিনি ।
পাঁচ-কান হওয়ার আগেই চাকর-বাকরদের দিয়ে মৃতদেহটার সৎকারের বন্দোবস্ত করালেন প্রশান্তবাবু কিন্তু তাঁর মনটা খচখচ করতেই লাগলো । তাঁর বারবার মনে হতে লাগলো এটা ওই তলোয়ারটা দিয়েই কাটা হয়েছে । কিন্তু কে এভাবে হত্যা করল কুকুরটাকে ! তবে কি তিনি নিজেই !!! না, না তা কি করে সম্ভব ! তলোয়ারটা তিনি কিনেছেন বটে কিন্তু ওই সাজিয়ে রাখার জন্য বা দু'এক জনকে ডেকে দেখানোর জন্য, ওটা দিয়ে কারও খুন করার মতো সাহস এবং শক্তি দুটোই তাঁর নেই । তবে !!!
যথারীতি দিনের পর রাত্রি এলো । মাঝরাতে আবার

সেই একসাথে অনেক জনের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এল । প্রশান্তবাবু থর থর করে কাঁপতে লাগলেন । বুঝলেন আবার হয়তো সেই তলোয়ারটা তাঁকে ডাকবে । তার সেই হৃদয় বিদীর্ণ করা আহ্বান "এসো... আমায় রক্ত দাও...আমায় পরিতৃপ্ত কর“ যেন তাঁর কানে বাজতে লাগল । তিনি জোর করে বালিশে মুখ গুঁজে থাকলেন । তারপর আর তাঁর কিছু মনে নেই ।

ভোর হতেই ঘরে ঢুকল কাজের ছেলে রঘুবীর আর দারোয়ান ভীমসেন । রাতে এরাই এ বাড়িতে থাকে বাকিরা সন্ধ্যের আগেই চলে যায় । এরপর তারা যা শোনাল তাতে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় প্রশান্তবাবুর ।

প্রশান্তবাবু মাঝরাতে তলোয়ারটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামেন । ভীমসেন তখন একটু বাথরুমে গেছিল । এই ফাঁকে তিনি বাইরের গেট খুলে বেরিয়ে যেতে থাকেন ভীমসেন প্রশান্তবাবুকে পিছু থেকে হাঁক দেয় । কিন্তু তিনি উন্মত্তের মতো তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন । তারপর রাস্তার উপর ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে করতে হঠাৎ রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা

ঘুমন্ত অন্ধ ভিখারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান তারপর নিমেষে তার গলায় এক কোপ বসান । সাথে সাথে তার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায় । মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহটা খানিকক্ষণ ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । তারপর তিনি আবার বাড়ি ফিরে এসে তলোয়ারটা যথাস্থানে রেখে শুয়ে পড়েন । রাতে ভয়ে আর প্রশান্তবাবুর কাছে আসার মতো সাহস জোটাতে পারে নি ভীমসেন । সে সব কথা রঘুবীরকে জানায় তারপর এখন দুজন মিলে তাঁর ঘরে এসেছে । প্রশান্তবাবু রাস্তার দিকের জানালা ফাঁক করে দেখলেন রাস্তার ওপাশে ল্যাম্পপোস্টের নীচে তখনও একটা লোকের দু'টুকরো দেহ পড়ে রয়েছে । তিনি সাথে সাথে লকারের চাবিটা ভীমসেনের হাতে দিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন "যত টাকা লাগে নিয়ে নাও কিন্তু আমাকে এ যাত্রা তোমরা বাঁচাও । লাশটার কিছু ব্যবস্থা কর ।"

কিন্তু লাভের লাভ কিছু হল না । একটা পুলিশের গাড়ি তক্ষুনি এসে থামল লাশটার সামনে । যেহেতু ওখান থেকে প্রশান্তবাবুর বাড়িটাই সবচেয়ে সামনে আর আসেপাশে বিশেষ কোনও বাড়ি নেই তাই অবধারিত ভাবে প্রথম টোকাটা তাঁর বাড়িতেই পড়ল ।

প্রশান্তবাবু হাত জোড় করে বললেন “প্লিজ, পুলিশকে কিছু বোলো না । তোমাদের টাকার অভাব হবে না । ... হায় ভগবান ! কি কুক্ষণে যে এই অভিশপ্ত তলোয়ারটা কিনেছিলাম !”

***

তাই হল । রঘুবীর আর ভীমসেন পুলিশকে কিছু জানালে না । তবে কথায় আছে ‘পুলিশের চোখ’ ! সাব ইন্সপেক্টর হীরালালবাবু আর একজন কনস্টেবল সব ঘরগুলো ঘুরে দেখতে দেখতে প্রশান্তবাবুর শোবার ঘরে এলেন । সেখানে তখনও টেবিলের উপর খাপবদ্ধ তলোয়ারটা নামানো । হীরালালবাবুর চোখ ঝলমল করে উঠল । যেন এই জিনিসটিই তিনি এতক্ষণ খুঁজছিলেন । তিনি পকেট থেকে রুমালটা বার করে টেবিল থেকে তুলে ময়ান থেকে ঝকঝকে তলোয়ারটা বার করে প্রশান্তবাবুর সম্মুখে তুলে ধরে বললেন “এটা আপনার !”

প্রশান্তবাবু থতমত খেয়ে বললেন “হ্যাঁ, অ্যান্টিক পিস । দিল্লি থেকে কিনেছি । কাগজ আছে ।“

“আচ্ছা ! কিন্তু এসব জিনিষ তো বাড়ি সাজাবার জিনিষ

নয়, প্রশান্তবাবু”

প্রশান্তবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে কোনও সুযোগ না দিয়েই হীরালালবাবু আবার বললেন “বডিটা কি দেখেছেন ? প্রাথমিক অনুমান গলাটা কিন্তু এরকম কোনও অস্ত্র দিয়েই এক কোপে কাটা হয়েছে । তাই আপনিও সন্দেহের বাইরে নন ।“

“দেখুন আপনি কিন্তু মিথ্যে দোষারোপ করছেন । অযথা একটা ভিকিরিকে মেরে আমার কি লাভ ! আর আমি খুন করলে কি খুনের অস্ত্র এভাবে টেবিলে সবার সম্মুখে সাজিয়ে রাখতুম, না আমি এভাবে বসে থাকতুম ! ...আমার বাড়ির সামনে খুন হলে যে সবার আগে আমার দিকেই সন্দেহ যাবে এটা না বোঝার মত বাচ্চা আমি নই নিশ্চয় !” আমতা আমতা করে বললেন প্রশান্তবাবু ।

“গুড পয়েন্ট ! কিন্তু লাভ কিছু হবে না মিস্টার চৌধুরী । খুনিকে আমি খুঁজে বার করবই । বাই দ্য ওয়ে, আপনি ডকুমেন্টগুলো দিন আর এটা ফরেনসিক টেস্টের জন্য নিয়ে চললাম । ... জানি আপনার টাকা আছে এবং উপর মহল পর্যন্ত পরিচয়ও আছে । কিন্তু

যে খুন হয়েছে তার না টাকা আছে না পরিজন তবে আপনাকে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি খুনিকে আমি খুঁজে বার করবই । প্রমিস । আর হ্যাঁ, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত না জানিয়ে কেউ কোথাও যাবেন না ।“
বলে হীরালালবাবু চলে গেলেন ।

***

দিন কয়েক পর । বাগানের পাশে বসে চা খাচ্ছিলেন প্রশান্তবাবু আর অজিতবাবু । “যাই বলুন ওই তলোয়ারটা কিন্তু অভিশপ্ত ... এই ক’দিন তলোয়ারটা নেই আমার ঘুমে কিন্তু কোনও ব্যাঘাত ঘটে নি । আর কারও রক্তপাতও ঘটে নি ।“ বললেন প্রশান্তবাবু ।

“আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি এসব আপনার মনের ভুল । একটা প্রাণহীন জড়পদার্থ নিজে থেকে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে পারে না, প্রশান্তবাবু ! মনকে শক্ত করুন ।”
“আপনি যাই বলুন ওই তলোয়ার আর আমি ফেরত চাই না । এই বেশ আছি । তবে ওদিকটা একটু দেখবেন । এ যাত্রা আপনারা আমাকে বাঁচান ।“
“দেখুন কমিশনারসাহেব আমার বাল্যবন্ধু ঠিকই কিন্তু

তিনি অন্যায় কিছু করবেন না । তবু আমি আপনার কথা কিছুটা বলেছি । এইসব ভৌতিক ব্যাপার–সেপার তো ওনারা বিশ্বাস করবেন না তাই আমি একটু অন্যভাবে জানিয়েছি... চিন্তা করবেন না । একটা ভিকিরিকে নিয়ে আশা করি বেশি জল ঘোলা হবে না..."

এমন সময় একজন কনস্টেবল নিয়ে সাব ইন্সপেক্টর হীরালালবাবু প্রবেশ করলেন । "গুড মর্নিং ।" তারপর অজিতবাবুকে দেখে বললেন "ও আপনিও এখানে ! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ! তা ভালো আছেন তো !"

"হ্যাঁ । ভালো । বসুন ।"

প্রশান্তবাবু কেমন যেন চুপসে গেলেন । "কি মিস্টার চৌধুরী । চা বলবেন না !"

"সরি ।" বলে রঘুবীরকে চা আনতে বললেন ।

"এই নিন আপনার অ্যান্টিক পিস । সাবধানে রাখবেন । খুব মূল্যবান আর দুষ্প্রাপ্য জিনিষ । তবে রক্তের কোনও ট্রেস পাওয়া যায় নি । একেবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন ।" বলতে বলতে ইশারায় কনস্টেবলটিকে কাছে ডাকলেন এবং টেবিলে নামিয়ে দিলেন ময়ান-সুদ্ধ তলোয়ারটা । "তবে... আপনাকে এখনও সন্দেহের

তালিকার বাইরে রাখা যাচ্ছে না । সরি ।“

প্রশান্তবাবু তবু কিছুটা স্বাস্তি পেলেন । হীরালালবাবু চা শেষ করে বিদায় নিলেন ।

“আর আমি এটা বাড়িতে ঢোকাতে চাই না ।“
হীরালালবাবু চলে যেতেই বললেন প্রশান্তবাবু ।

“কি অবান্তর কথা বলছেন !“

“না, অবান্তর নয় । ওটা বড় সাঙঘাতিক জিনিষ । আপনি জানেন না ।“

“আচ্ছা কেমন সাঙঘাতিক জিনিষ তা একবার আমি নিয়ে গিয়ে দেখতে পারি কি !”

“দেখুন আমি আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না । তবু যদি সাহসে কুলোয় তো আমার আপত্তি নেই । আর ওর মুখ দেখতে আমি চাই নে ।“
“আচ্ছা বেশ । তাহলে আমিও একবার পরখ করে দেখি । আপনার কথা সত্যি না মিথ্যে !“
যাবার সময় অজিতবাবু তলোয়ারটা হাতে নিয়ে নিজের

গাড়িতে উঠলেন ।

***

দিন কয়েক কোনও খারাপ খবর এল না । ওই অন্ধ ভিখারিটির খুনিও ধরা পড়ল । একটা পাগল গোছের লোক । সাজানো কি সত্যি তা প্রশান্তবাবু জানেন না তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন । রঘুবীর আর ভীমসেনকে টাকা-কড়ি দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বললেন । তারা মনের আনন্দে প্রশান্তবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে গেল । হঠাৎ ওই সোয়া বারটার দিকে সাব ইন্সপেক্টর হীরালালবাবুর একটা ফোন এল । "নমস্কার । খবর নিশ্চয় শুনেছেন ... খুনি ধরা পড়েছে । এবার আপনারা ফ্রি ... তবে আমি স্যাটিস্ফায়েড নই । আমার সন্দেহ যার প্রতি তিনি এই সব চুনোপুঁটি নন ... একেবারে রাঘব বোয়াল ! অফিসিয়ালি হয়তো কেসটা খুব তাড়াতাড়ি ক্লোজড হয়ে যাবে কিন্তু আমি এত সহজে কেসটা ক্লোজ করছি না । অপরাধীকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি ক্ষান্ত হচ্ছি না । যাই হোক, আপনার জন্য একটা খবর আছে ..."
"আমার জন্য ! কি খবর !" অবাক হয়ে বললেন

প্রশান্তবাবু ।
“খবরটা আপনাকে নিজেকেই সংগ্রহ করতে হবে আমি শুধু ঠিকানাটা জানিয়ে দিচ্ছি ... মিলেনিয়াম পার্ক... টাইম দুপুর একটা ... বাই ।“

প্রশান্তবাবু হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন । কি খবর আর দিতে চাইছেন হীরালালবাবু ! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ১২:৩০ । তিনি আর কাল বিলম্ব না করে গাড়ি বার করলেন । তারপর মিলেনিয়াম পার্কে গিয়ে দেখলেন পার্ক মোটামুটি ফাঁকা গুটিকতক লোক গাছের ছায়ায় চেয়ারের উপর বসে রয়েছে । হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কোণার একটা চেয়ারের দিকে ! দেখলেন রঘুবীর আর ভীমসেন বসে । এরা এখানে কি করছে ! এদের তো সোজা বাড়ি যাওয়ার কথা ! ব্যাপারটা জানার জন্য সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন তিনি । তারপর বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে দেখলেন সেখানে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন অজিতবাবু ! তিনি তাদের হাতে বেশ কিছু টাকা দিলেন তারপর আবার যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন ।

প্রশান্তবাবু কিছু বুঝতে পারলেন না । তাঁর বাড়ির

কর্মচারীদের লুকিয়ে অজিতবাবু কেন টাকা দিচ্ছেন ! কি করাতে চাইছেন উনি ! তবে কি আবার তাঁকে পুলিশের জালে ফেলতে চান !

প্রশান্তবাবু রঘুবীর আর ভীমসেনের পথ আগলে দাঁড়ালেন । “অনেক হয়েছে ... সব কথা আমাকে খুলে বল... আমি সব জানতে চাই ...নইলে ... “ বলে একটা ছোট্ট পিস্তল বার করলেন তিনি ।

তারপর তিনি যা শুনলেন তাতে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার জোগাড় ! এ যেন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্যের থেকে কোনও অংশে কম নয় ! তাঁর সাথে যেটা ঘটেছে সেটা ওই তলোয়ারটার অলৌকিক কাণ্ড নয় অজিতবাবুর শয়তানি ! রঘুবীর আর ভীমসেনকে হাত করে মাকড়সার মতো জাল বুনেছেন অজিতবাবু আর তিনি অসহায় পতঙ্গের মতো সে জালে আটকা পড়েছেন । তলোয়ারটা দেখার সাথে সাথেই যে অজিতবাবুর চোখ চিক চিক করে উঠেছিল তা তাঁর চোখকেও ফাঁকি দিতে পারে নি । কিন্তু এতো বড়ো প্রতারণা তিনি করতে পারলেন তাঁর সাথে !

সে তলোয়ার হয়তো আর তিনি ফেরত পাবেন না ।

আর পেতেও চান না । তলোয়ারটা সত্যিই অভিশপ্ত এতদিনের বন্ধুত্ব এক নিমেষে কেমন ছিন্ন করে দিল !

তবু একবার অজিতবাবুর মুখ থেকেই সব কথা জানার জন্য ফোন করলেন তিনি । নম্বর ডায়েল করতেই শুনলেন "দিস নম্বর ডাজ নট এগজিস্ট ..." ।
প্রশান্তবাবু গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন । মনটা বড় ভারাক্রান্ত । দেশের মাটি, দেশের পরিচিত মানুষজনদের ছেড়ে তিনি ছেলে–মেয়েদের সাথে বিদেশ- বিভুঁয়ে যেতে চান নি । অথচ এরাই তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করল ! শুধু তলোয়ারটা নয়, যে মানসিক চাপের মধ্যে তিনি গেলেন তাতে তো যেকোনও সময় একটা কিছু ঘটে যেতে পারত !
তাহলে, সেই ভিকিরিটাকে কে খুন করল ? অজিতবাবু ! হীরালালবাবু কি তবে সব জানতে পেরেছেন ! তাই কি তিনি রাঘব বোয়ালের কথা বললেন ! মাথাটা যেন চক্কর দিতে লাগল প্রশান্তবাবুর ।
গাড়ি পার্ক করে ঘরে ঢুকতেই নতুন কাজের ছেলেটি বলল "দুজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন ।"
প্রশান্তবাবু দেখলেন কাল আলখাল্লা জাতীয় পোশাক-

পরা একজন বয়স্ক মুসলিম ভদ্রলোক আর একজন কম বয়স্ক ছেলে খুব সম্ভবত সেও মুসলিম । পরনের জামা কাপড় অত্যন্ত সাধারণ ।

“হ্যাঁ, বলুন কি বলবেন ?”

“আপনি আমাদের চিনবেন না । আমরা দিল্লী থেকে আসছি । সেই তলোয়ারটা কোথায় !" ভাঙ্গা বাংলায় বললেন ভদ্রলোক ।

"কোন তলোয়ার ?"

"কেন বুঝেও না বোঝার ভান করছেন । ওটা সাংঘাতিক জিনিষ আছে ! দয়া করে ওটা আমায় ফেরত দিন”

“দেখুন আপনাদের জারি-জুরি সব ধরা পড়ে গেছে । অজিতবাবু আমায় ধোঁকা দিয়ে তলোয়ারটা নিয়ে গেছেন । হয়তো এতদিনে বেচেও ফেলেছেন । আমি সব জেনে গেছি এখন আর এসব করে কি লাভ !“

“অজিতবাবু ! তিনি আবার কে ? ...আজকে তলোয়ারটা আমায় পেতেই হবে । নইলে অনর্থ হবে ।“

“কেন আর নাটক করছেন !”

“নাটক নয় সত্যি ঘটনা । জানেন বোধহয়, এই তলোয়ারটা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের । এটা সেই অভিশপ্ত তলোয়ার যা দিয়ে কাটা হয়েছিল মহাপ্রাণ দারা

শিকোহর মস্তক । এটা বহু বছর ধরে আমাদের ঘরেই ছিল । আমার আব্বা বলে গেছিলেন এ বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ কারও হাতে এটা যেন না পড়ে । মিহাকের সময় যখন আকাশে চাঁদ দেখা যায় না তখন এ জেগে ওঠে, রক্ত চায় । সেদিন কেউ এটা হাতে নিলে যেকোনও ভাবে এটা তাকে দিয়ে খুন করাবেই । এ জিনিষ ফেলে দেওয়াও যায় না আবার রাখাও কঠিন । তবু সামলে রেখেছিলাম । কিন্তু হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য আমার পৌতা নিজাম ওটা বিক্রি করে বসে । আমি সুস্থ হয়ে সব জানতে পারি । কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে । আমরা সেই দোকানে যাই । বিল ভাউচারে আপনার নাম ঠিকানা লেখা ছিল । খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি আর নিরাশ করবেন না । টাকা আপনার ফেরত দিতে পারব না । কারণ নিজাম যেটুকু টাকা পেয়েছিল আমার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করে ফেলেছে ।“
“আমি জানি না আপনি সত্যি বলছেন কি না । তবে এখন আর আমার কিচ্ছু করার নেই । তলোয়ারটা আর আমার কাছে নেই ।“

“দেরি করবেন না । তবে তাঁর কাছেই চলুন । আজ

মিহাকের সময় আবার সে রক্ত চাইবে ... আবার কারও মৃত্যু নিশ্চিত । গত মাসে অমাবস্যার সময় ওটা আপনাকে দিয়ে কি করিয়েছিল মনে নেই !”

“এ সব মিথ্যে ! আমি কিছু করি নি ।“ চিৎকার করে উঠলেন প্রশান্তবাবু ।

“আমি সব জেনেছি । কুকুরটার মৃত্যু কিন্তু আপনার হাতেই হয়েছিল । সেদিনও অমাবস্যা ছিল । মনে করার চেষ্টা করুন । ওটা কোনও ছল–চাতুরি ছিল না । হওয়া সম্ভবই নয় । চলুন, আমাকে আপনার সেই বন্ধুর কাছে নিয়ে চলুন ।“
ভদ্রলোকের কথায় একটা আলাদা তেজ ছিল প্রশান্তবাবু তাকে না করতে পারলেন না । গাড়ি বার করে অজিতবাবুর ঘরের দিকে রওনা দিলেন । কিন্তু বাড়ি পৌঁছে নিরাশ হয়ে দেখলেন দরজায় তালা দেওয়া । ফোন নং তো আগে থেকেই বন্ধ ।

আর কোনও উপায় নেই । জানি না কাল সকালের নতুন সূর্য কি খবর বয়ে আনবে !

***

পরদিন বিকেলের সংবাদপত্রটা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা জায়গায় প্রশান্তবাবুর চোখ আটকে গেল । “নামকরা ইতিহাসবিদ অজিতেশ সরকারের রহস্য মৃত্যু”

তিনি খবরটা ভালো করে পড়তে লাগলেন । কলকাতার এক নামকরা হোটেলের কামরা থেকে সকালে অজিতবাবুর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ উদ্ধার হয় । কেউ যেন ধারল তলোয়ারের এক কোপে তাঁর মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে । কিন্তু ঘর থেকে কোনও তলোয়ার বা এ জাতীয় কিছু উদ্ধার হয় নি । এমন কি সি. সি. টিভি ফুটেজ থেকেও কিছু পাওয়া যায় নি । ঘটনার সময় তাঁর রুম থেকে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতেও দেখা যায় নি । ঘরে তিনি একাই ছিলেন । পুলিশের অনুমান তিনি আত্মহত্যা করেছেন । তবে সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত অস্ত্রটি ওখানেই পড়ে থাকার কথা । রহস্য এখানেই ।

প্রশান্তবাবুর পায়ের তলার মাটিটা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠল । তিনি ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লেন । তবে কি ওই বয়স্ক মুসলিম লোকটি ঠিক কথাই বলছিলেন !

তাহলে ওই অভিশপ্ত তলোয়ারটা গেল কোথায় ! তবে কি আবার কেউ !!!
নাকি কেউ এই সবের মধ্যে অজিতবাবুকে তাঁর কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে গেলেন !

নিতাই

তুহিন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

আজ কালীপুজো ; যেই সেই তিথির পুজো নয়, একেবারে ভাদ্র মাসের কালীপুজো। ছোটবেলায় এই দিনটি বড়ই ভয় পেতাম। গুরুজনরা বিশেষ করে আমার ঠাকুমা বলতেন, "এই দিনটি খুবই মারাত্মক হয়, রাত হলেই নানান অপদেবতা মর্তে এসে ঘুরে বেড়ান "। আমি ভয়ে বাইরে তো বেড়োতামই না, উপরন্তু ওই পচা গরমে শোয়ার সময় জানালা দরজা ভালো করে দিয়ে শুতাম, যাতে কোনো অপদেবতা উঁকিটি পর্যন্ত না মারতে পারেন। সে সময় আবার লোডশেডিং হলে দের দু ঘন্টা আগে আসতোনা, এমনকি বেশ রাতে লোডশেডিং হলে তো ব্যস, সারারাতের কারবার,এমন বহু রাত্রি জাগতে হয়েছে গরম আর মশার দংশন নিয়ে। আর এই মাহেন্দ্রক্ষণ যদি একসাথে কোনো বছরের ভাদ্র মাসের ওই দিনটি তে হতো, মানে ওই কালী পুজোর দিন লোডশেডিং হতো তবে একেবারে ষোলোকলা পূর্ণ, ঘুটঘুটে অন্ধকারে চুপটি করে মায়ের আঁচলে তলায় থাকা ছাড়া

উপায় ছিলোনা।
এমন ভাবেই বড় হয়ে উঠলাম, আর ধীরে ধীরে মগজের শিক্ষা এই সমস্ত দিনের ভ্রান্তি কে ক্রমশ হাস্যকর করে তুলতে লাগলো। তাই আজও আমি যখন আমাদের পাশের চক্কোত্তি বাড়ির কালীপুজো দেখছিলাম, পুরোনো সেইসব দিনের কথা মনে পড়তে লাগলো। তবে সেই সঙ্গে আরো একটি স্মৃতির কথা আজ বড় মনে পরে গেলো। সেই ছোটবয়সের স্মৃতি, এবং সেটা বলার জন্যই আমার এই কাহিনীর অবতারণা।
আজ যখন মন দিয়ে পুজো করা দেখছি তখন পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে কেমন যেন ঠিক জাগ্রত ভাবটি আসছিলো না। কিন্তু যার মন্ত্র পাঠ শুনে প্রতিটি শিরা উপশিরা দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে যেত, প্রতিটি রোমকূপ কাঁটা দিয়ে উঠতো, সেই নিতাই পুরোহিতের কথা খুব মনে পরে যাচ্ছিলো।

আজ থেকে প্রায় আঠারো উনিশ বছর আগেও এই বাড়ির মন্দিরেই এই প্রতিষ্ঠিত শ্যামা মায়ের সামনেই পুজো করতো। আসলে কালী পুজোই তার পেশা আর নেশা ছিল। যদিও পূর্ব পুরুষ প্রদত্ত ঐতিহ্য বহন নয়, একান্তই নিজের বাসনা আর ভক্তি তাকে এই পথে

নামিয়েছিল। আমার ঠাকুমা বলতেন, নিতাই নাকি ছোট থেকেই খুব কালী ভক্ত ছিল। তাই পড়াশুনা ছেড়ে কালী পুজো নিয়েই বেশি মেতে থাকতো। তাদের পরিবার ছিল খুব গরিব, আর যেহেতু বাড়িতে পুজো আচ্চার বালাই ছিলোনা, তাই সে কালী পুজো করতো অন্য ভাবে। ব্যাপার টা হলো, বিশেষ অমাবস্যার তিথির দিনটি তে কালী পুজো হয়ে গেলে পরদিন বিসর্জিত কালির কাঠামো নিয়ে বাড়ি আসতো। এরপর দিন রাত এক করে সে কাঠামোতে পুকুর থেকে মাটি তুলে এনে প্রলেপ দিতো। শরীর গঠন হয়ে গেলে একটা গোলাকার মাটির ডেলায় চোখ মুখ জিব দিয়ে মাথা হিসেবে বসিয়ে দিতো। কালী আর শায়িত শিবের গায়ে আলকাতরা রং মাখাতো, চোখ জিব হাতের তালু আলতা রঙে রাঙাতো, ব্যাস, নিতাই ঠাকুরের কালী মূর্তি তৈরী। ঠাকুমা বলতেন যে, ওই মূর্তি কী যে বীভৎস হতো বলার অপেক্ষা রাখেনা। সত্যি তো, ঐরকম চেহারা, তার ওপর মূর্তির মাথায় নেই চুল, ভয়ানক তো হবেই!এবার পুজোর পালা। সাঙ্গ পাঙ্গ জোটানো নিতাইয়ের অভাব ছিলোনা। পাঠকাঠির কাঠামো করে, নিজের মায়ের পুরোনো শাড়ি দিয়ে ঘিরে, ওপরে কঁচু পাতার চাউনি দিয়ে প্যান্ডেল তৈরী হতো, অন্য ছেলেরা

ভাঙা নারকেল মেলায় মোম বাতি জ্বালিয়ে একটি লাঠির সাথে আটকে প্যান্ডেলের সামনে হ্যালোজিন লাইটের ব্যবস্তা করতো। রাতে বেশ ভালোই লাগতো। সকালে পুজো করতো স্বয়ং নিতাই ঠাকুর, মা মা করে কী মন্ত্র পড়তো সেই জানে, বলিও দিতো নিজে। এক্ষেত্রে বড় বড় কঁচু গাছের ডাট কেটে এনে তাতে তেল সিধুর মাখিয়ে "জয় মা " বলে দা দিয়ে এক কোপে বলি সম্পূর্ণ হতো।

তো যার এতো ভক্তি তাকে কি আর কেউ আলাদা করতে পারে কালী মায়ের সেবা করা থেকে দূরে রাখতে? তাই একদিন নিজের প্রচেষ্টায় যথা যত নিয়ম পালন করে, পুজোর মন্ত্র শিখে সত্যি কারের একজন যথার্থ পুরোহিত সে হয়ে উঠতে পেরেছিলো। তিন চার বাড়ির যজমান হয়ে প্রতিষ্ঠিত কালী পুজো করে দিব্বি চলে যেত। বিয়েও করেছিল, ছেলেও একটা হলো, কিন্তু বৌ টা চলে কেন গেছিলো টা জানতে পারিনি। তবে ছেলেটাকে আমি দেখেছি, নাম ভ্যাবলা। ভালো নাম জানিনা, সত্যি ভ্যাবলা গোছের, উঠতে বললেন উঠতো, বসতে বললে বসতো। পাড়ার লোকের কাজ বিনা কৈফিয়ত এ করে দিতো।

নিতাই ঠাকুরের একটা আশ্চর্য ঠোঁটের গড়ন ছিল।

ব্যাপারটা হলো, তার প্রায় সর্বক্ষণ সামনের পাটির দাঁত বের হয়ে থাকতো, অথচ দাঁতের মাড়ি কিন্তু উঁচু ছিলোনা। তাই কখন যে হাসতো আর কখন যে রাগ করতো বোঝাই যেতোনা। যেন সবসময় হেসে চলেছে।একদিন এক লোকের সাথে তার তুমুল ঝগড়া বাঁধে। সেই সময় তার মুখের অবস্থা দেখে আশেপাশের লোক হেসেই গড়াগড়ি খেয়েছিলো। গালাগাল দিচ্ছিলো, নানান কটু কথা বলছিলো, সপ্তমে সুর ছড়িয়ে ধমকাচ্ছিলো, অথচ মনে হচ্ছিলো সে সারাক্ষন হেসে হেসে এসব বলেচলছিলো। মানে এই দৃশ্য না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। এমনকি যার সাথে ঝামেলা সেও নিজে একবার হো হো করে হেসে ফেলেছিলো।

দুই

যাই হোক এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষটির পেছনে অনেক মানুষই লাগতো। বিশেষ তার এই ভক্তি নিয়ে টিকা টিপ্পনিও কম শুনতে হয়নি। আর সেই সব অবিশ্বাসীর বিদ্রুপ নিবারণের জন্যই সেই রাতে এক কান্ড করেছিল।

প্রতিবারের মতো আমার উৎসাহের ঘাটতি কম ছিলোনা।চক্কোত্তি বাড়ির সাথে আমাদের বাড়ির হৃদ্যতা বহু কালের। তাই অনুষ্ঠান হলে বলতে হয়না, আপনা থেকেই চলে যেতাম দরকারের সঙ্গী হতে। যদিও আমি ছোট ছিলাম তবুও ফুল সজ্জা, আলোক সজ্জায় সাহায্য করে ফেললাম। যেহেতু প্রতিষ্ঠিত শ্যামা মূর্তি, তাই ঠাকুর পাঁচদিন আগের থেকে নতুন করে রং করা হতো, তাতেও আমার উপস্থিতি থাকতো। বেশ এক দেড়শো লোক রাতে খাওয়ানো হতো, তার রান্না বান্নার লোক ও উপস্থিত হয়ে গেছিলো। সকাল বেলা নিতাই ঠাকুর এসে সরোজমিনে তদারকি করে গেলো। রাত পোনে ন'টায় চতুর্দশী ছাড়বে। সেই মতো করে সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেলো।

যথারীতি সন্ধ্যে থেকে ঢাকে কাঠি পড়লো। সমস্ত মন্দির চকমকি আলোতে উদ্ভাসিত, মাইকে শ্যামা সংগীত সকাল থেকেই বেজে চলছে। আমি সেজে গুঁজে মন্দিরে এলাম।বাড়ির মেয়েরা সব পুজোর কর্মে ব্যস্ত, ছেলেরা মায়ের সাজসজ্জায় নিপুন ভাবে নিযুক্ত। শ্যামা মায়ের মূর্তি তে কত যত্ন করেই না লাল পেড়ে বেনারসি শাড়ী, সোনার গয়না, রজনীগন্ধা আর গোলাপের মালা, রুপোর মুকুট আরো নানান শোনা রুপার অলংকারে সাজানো

হয়েছিল। যেন রক্ত মাংসের মাতৃ প্রতিমা।লোকজন ভালোই হয়েছিল, সমস্তই প্রায় তৈরী হয়ে ছিল।

নিতাই ঠাকুর লাল পেড়ে ধুতি আর নামাবলী গায়ে মন্দিরের এক কোনায় বসে মায়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। অমন সময় বাড়ির কর্তা অমল ঠাকুর মন্দিরে এসে নিতাই ঠাকুর কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হাঁ রে নিত্য, তুই এবারও ভড়ে পড়বিতো?"
নিতাইয়ের চমক ভাঙলো, সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে বললো," আজ্ঞে কত্তা। তবে একখান কথা ছিল।"
অমল বাবু বললেন," বল কি কথা?"
উপস্থিত অমল বাবু ছাড়াও অনেক নিমন্ত্রিত, অনাহুত, আর বাড়ির লোক জন তো ছিলই। নিতাই হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে সে দাঁতের পাটি বের করেই বললো, "আপনারা সবাই একটু মন দিয়ে শুনুন আমার কথা।"
পাশে একটা ছোকরা ছেলেকে নিতাই বললো, "এই মাইকটার আওয়াজ কম কর। "সে ছোকরা মাইকের তদারকি করছিলো, নিতাইয়ের কথা মতো শব্দ কমিয়ে দিলো।
নিতাই শুরু করলো,"প্রতিবার আমিই যখন এই চক্কোত্তি

বাড়ির মায়ের পুজোয় ভড়ে পরি তখন এইবার তার অন্যথা হবেনা। তবে এইবার টা একটু আলাদা হবে, তা আগে থাকতে জানিয়ে রাখছি।"
আমরা সবাই বেশ একটু আগ্রহ সহ মুখে চেয়ে থাকলাম যে আলাদা কি হতে পারে!
অমল বাবু প্রশ্ন করলেন, "কি রকম শুনি?"
নিতাই বললো, "বলছি কাকা; আজকের এই রাতের মাহাত্ম অনেক, মা জাগ্রত হন, নানা অপদেবতা মর্তে এসে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু আজ কাল এসব আর কেউ মানতে চায়না। তারা বলেন অপদেবতা বলে কিছু নেই। এই নিয়ে আমাকেও অনেকে অনেক হাসি ঠাট্টা করেছে। তাই আজ আমি প্রমান করে দেবো যে অপদেবতা বলে কিছু আছে।"
ভিড়ের মাঝখান থেকে কেউ একজন হেসে বলে উঠলো, "তুই বুঝি আজ ভুত হয়ে দেখাবি রে নিতাই?"- সাথে আরো জনা পাঁচেক সেই হাসিতে যোগ দিলো। টিপ্পনি শুনে সাথে সাথে নিতাইয়ের চোখ যেন জ্বলে উঠলো, সেই হাসি মাখা দাঁত বের করে গর্জে উঠে আঙ্গুল তুলে সে হুঙ্কার দিয়ে বললো, "ওরে অবিশ্বাসীর দল! তোদের যদি এতোই অবিশ্সাস, তবে নিজে চোখে দেখবি আজ।"

আগেই বলেছি নিতাইয়ের রাগ দেখানো তে সকলে হেসে ওঠে, তাই এইবারও মৃদু হাসির গুঞ্জন শোনা গেলো বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা তটস্থ ভাব ও আমি লক্ষ্য করলাম।

বিশেষত অমল বাবু ভিড়ের উদ্দেশ্যে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,"আআআআ, ইয়ার্কি ঠাট্টা নয়!" তারপর নিতাইয়ের দিক চেয়ে বললেন, "তা করবি তা কি?"

নিতাই কিছুটা শান্ত হয়ে অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, "আজ রাত একটায় আমি ভরে পড়বো। সেই সময় আমাকে কেউ ছোবেননা। আমি আজ আপনাদের সকলকে ব্রম্মদৈত্ত দেখাবো।"

বলে কি! ব্রম্মদৈত্ত! আমার তখন কাঁচা বয়স, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তা এখনো মনে করতে পারি। নিতাই ঠাকুরের দিকেও যেন তাকাতে ভয় করছিলো। চোখ দুটো যেন লাল রক্তবর্ণ, গলা থেকে মোটা উপবীত কোমর পর্যন্ত ঝুলছে, কপালে রক্ত চন্দনের মোটা করে টিপ লেপা। ক্ষণকালের জন্য ওকেই ব্রম্মদৈত্ত মনে হচ্ছিলো।

সবাই প্রায় নির্বাক। কিন্তু অমল বাবু কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "এসব আবার কি ছেলেমানুষি নিতাই, যারা বিশ্বাস করেনা তারা নাই করতে পারে, তাতে তোর

বা আমার কী এসে গেলো?"
নিতাই কিন্তু আজ দমলোনা, বললো, "ক্ষমা করবেন কাকা, কিন্তু মায়ের আদেশ অমান্য করতে আমি পারবোনা।"
অমল বাবু অবাক হয়ে বললেন," মায়ের আদেশ মানে?"
-"মানে কাল রাতে মা আমায় স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন যে আমি যেন প্রমান করে দিই যেমন দেবতা আছেন তেমনি অপদেবতাও আছেন।"
নিতাইয়ের ভক্তির ওপর অমল ঠাকুরের একটু দুর্বলতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন নিতাইয়ের তারা মায়ের প্রতি টান তা একটু আলাদা। তাই তার কথাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না, বরং বললেন, "বলিস কী, স্বপ্নাদেশ!তা আমাদের বাড়ি তে তো সবাই বিশ্বাসী, তুই কী এখানেই দেখাবি?"
নিতাই আশস্ত করে বললো, "না কাকা,ভয় নেই;আমি ভড়ে পরে সোজা শ্মশানে চলে যাবো, ওখানেই দেখতে পাবেন।" তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বললো, "যাদের বুকের পাটায় দম আছে তারা যেন যায় আমার পেছন পেছন, সব সত্য মিথ্যা প্রমান হয়ে যাবে।"
ভিড়ের মধ্যে জনা পাঁচেক বলে উঠল, "হাঁ যাবো যাবো,

দেখবো তোর ব্রম্মদৈত্ত কেমন দেখতে!"
অমল বাবু কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন, "তাহলে আমিও যাবো, মায়ের চ্যালা বলে কথা। অমান্য করি কী করে!"
অমনি অমল বাবুর পাঁচ ছেলেও বলে উঠলো, "তাহলে আমরাও যাবো।"
নিতাই সম্মতি জানিয়ে বললো, "তাহলে বেশ, ওই কথাই থাকলো, ঠিক একটায়।"- বলে পুজোর কাজ তদারকি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এইদিকে আমার অবস্থা যে কী তা বলে বোঝানো অসম্ভব। ভুত দেখাবে, তাই ইচ্ছেও করছে যেতে, আবার ভয় ও করছে; আর শুধু ভুতের ভয়ই শেষ নয়, মা বাবার শাসনের ভয় তাও ছিল। তবু কী করে যে বুঝিয়ে ছিলাম, ঠাকুমা কেনই বা যেতে দিয়েছিলেন, তা আজ আর মনে পরে না। সাথে মধু ছিল, আমার বন্ধু, সে যেতে রাজি হওয়াতে হয়তো যেতে পেরেছিলাম। বয়সে দুই বছর বড় ছিল, তবু একসাথে খেলা ধুলো করতাম বলে ভালো বন্ধু ছিল।সে আমার সঙ্গী হবে তাই ভয়টা তখন একটু কম লাগছিলো।
যাইহোক, যথারীতি খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে পুজোর

সময় মতো মন্দিরে মধুর সাথে এসে জড়ো হলাম। দেখলাম ভিড় তা ভালোই। বুঝলাম ব্রম্মদৈত্ত দেখানোর কথাটি বেশ ভালোই চাউর হয়েছে।তাছাড়া লোকে যতই টিপ্পনি কাটুক, নিতাইয়ের ভড়ে পড়া সর্বজনবিদিত।সে দেখতেও লোকের অভাব কখনো কম দেখিনি।

ঠিক আটটা পঞ্চান্নতে নিতাই ঠাকুর পুজোয় বসলো। ধীরে ধীরে ঢাকের বোলের সাথে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হলো। অমল ঠাকুর আর বাড়ির সকলে হাত জোর করে পুজো মণ্ডপে বসে আরাধ্য দেবীর প্রতি ভক্তি সহকারে তাকিয়ে রইলেন।

তিন

এমন করে ঘড়িতে একটা বেজে উঠলো।নিতাই ঠাকুর ভড়ে পড়লো।

সেকি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সে মাথা বন বন করে ঘোরাতে শুরু করলো। "মা মা"- বলে সে কী ডাক! সমস্ত শরীর তার বার বার ঝাকুনি দিয়ে উঠছিলো। কখনো নিজের চুল ধরে টানছে, কখনো সামনে রাখা মনুষ্য করোটি হাতে নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলো, কখনো বা

তেল সিঁদুর নিয়ে নিজেই নিজের মুখে মেখে নিলো। কখনো বা তারা মায়ের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতে মন্ত্র বলে বলে হাতের কাছে যা পেলো ছুড়তে শুরু করলো। কখনো ফুল, কখনো ফল, আবার কখনো গামছা, এমনকি একবার পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে ছুড়তে যাবে অমনি অমল বাবুর ছেলেরা ধরে নিরস্ত্র করলো। এদিকে জোর কদমে ঢাক কাশর ঘন্টা বেজে চলেছে। আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। ওই অবিশ্বাসীর দলেরও অবস্থা তথৈবচ।

এমন কিছুক্ষন চলার পর হঠাৎ নিতাই উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রাগে যেন ফুঁসতে লাগলো। সে কী মুখের ভঙ্গি! যেন এখনই আমাদের ঘাড় মটকে দেবে! তারপর একটু চুপ থেকে সামনের দাঁতএর পাটি বের করে ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর কর্কশ স্বরে আমাদের উদ্দেশ্যে বললো,"চল তবে শ্মশানে, কার কত হিম্মত দেখবো আজ", -বলেই প্রায় এক লাফে আসন ছেড়ে বাইরে চলে এসে দ্রুত পদে হাঁটা শুরু করলো। সে জোড়ে জোড়ে "মা মা" করতে করতে এই নিশুতি রাতে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চললো, আর পেছনে জনা দশেক লোক হারিকেন হাতে নিয়ে পেছন পেছন রওনা

দিলো। অমল বাবু, তার ছেলেরা আর সব শেষে আমরা দুই বন্ধু অজানা আতঙ্কে গুটি গুটি পায়ে তাদের পিছু নিলাম।

হাঁটা পথে মিনিট দশেক সময়ের মধ্যে শ্মশানে এসে পৌঁছে গেলাম।তখন দেড়টা বাজে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু শ্মশান কালী মন্দিরে একটা বড় সলতের প্রদীপ জ্বলছে। কিছুক্ষন আগে হয়তো একটা মরা পোড়ানো হয়েছিল, তার প্রমান চিতার সামনে গেলেই বোঝা যায়। আশেপাশে ঝিঁঝি পোকার ডাক। পাশের ধু ধু প্রান্ত থেকে শিয়াল কুকুরের ডাক ও শোনা যাচ্ছিলো।
আমরা দুই বন্ধু সবার পেছনে একে অপরকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ দিব্বি কানে আসছিলো।
এইদিকে নিতাই ঠাকুর চিতার পাশেই একটি উঁচু ঢিবির ওপর উঠে অট্ট হাস্যে সকলকে যেন আরো সন্ত্রস্ত্র করে তুলছিলো।যারা অবিশ্বাস করতো, তাদেরও মুখের অবস্থা খুব একটা আরাম দায়ক নয়।
যতই অন্ধকার থাকুক খোলা জায়গায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে বেশ কিছুটা দেখা যায়। আর তাই চিতার পাশেই যে যেখানে নিতাই দাঁড়িয়ে ছিল সেখান ঠিক

হাত দশেক দূরে ছোট একটা পুকুর, আর তার ওপারের লম্বা লম্বা জিলিপি গাছ গুলো কালো কালো হয়ে দেখা যাচ্ছিলো।

নিতাই আর সময় নষ্ট না করে পুকুরের ওপারের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে কর্কশ স্বরে বললো, "তোরা অবিশ্সাস করিস তো, তবে দেখ তোরা ওপারে চেয়ে দেখ.. ব্রম্মদৈত্ত দেখ! ব্রম্মদৈত্তর নৃত্য দেখ!"-বলেই জয় মা বলে আবারো অট্টহাস্যে আকাশে পাতাল কাঁপিয়ে তুললো।

আমরা সকলে নিতাইয়ের কথা মতো পুকুরের ওপারে যথা সম্ভব তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।মিনিট দুই পর হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলো।স্পষ্ট না হলেও দেখতে অসুবিধা হলোনা যে একটি দীর্ঘ দেহি সাদা শরীর যার মুন্ডু নেই, এমনকি হাঁটুর নিচ থেকেও নেই খালি গায়ে দাঁড়িয়ে মোটা গলায় জোড়ে জোড়ে হেসে চলছে। কাঁটা মুণ্ডুর বাম কাঁধ থেকে কালো মোটা একটা দড়ি কোমর পর্যন্ত ঝুলছে, পরনে সাদা ধূতি। হাঁ ব্রম্মদৈত্ত বটে!

-"ওরে বাবা রে!"- বলেই আমার বন্ধু আমায় ফেলে দিলো দৌড়। সামনে অমল ঠাকুর সহ আরো কিছু লোক ফিট হয়ে পরে গেলেন। তার ছেলেরা হারিকেন্

ফেলে কোনো ক্রমে তাকে তুলে ধরে বাতাস করতে লাগলো। কেউ কেউ নিজের অজান্তে মাটিতে বসে পরে জ্ঞান হারালো। আর আমার কথা কী বলবো? অনেক্ষন ধরেই আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিলো। এখন সেটা কাঁপুনি তে গেলো।ভয়ে কেঁদে ফেললাম। পা আর যেন চলে না, যেন দু পায়ে শিকল দিয়ে পাথরআটকে রাখা আছে।
এমনি করে আরো সময় এগোলো। আমি অজ্ঞান হবো হবো করছি, হঠাৎ ওপার থেকে ব্রম্মদৈত্ত একটা বিকট শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠলো। ভয়ে ঠিক তখন খেয়াল করিনি, তবে "বাবা গো " গোছের কিছু একটা হবে পরে বুঝেছিলাম। সাথে সাথে ব্রম্মদৈত্ত অদৃশ্য হলো। কোথায় গেলো ওতো ভেবে দেখার সময় নেই কারো। শুধু বুঝতে পারছিলাম এবার পালাতে হবে, কারণ তেনাকে আর দেখা যাচ্ছেনা, এপারে এসে নৃত্য করলে ভবসাগর পাড় নিশ্চিত। অমল ঠাকুরের ছেলেরা তাকে কাঁধে তুলে আমায় বললো, "কষে দৌড়া!"
আমিও চোখ বুঝে দিলাম ছুট। ঐটুকু পথ যেন কয়েক ক্রোশ মনে হতে লাগলো। ঝোপ ঝাড় রাস্তা পেরিয়ে দৌড়ে চলেছি, পায়ে চটি কোথায় কখন খুলে গেছে জানিনা। এর আগে এমন কখনো ছুটেছি বলে মনে

পরে না। যাইহোক সোজা বাড়ির সামনে এসে যখন ঘেমে নেয়ে স্নান করে ধপাস করে পরে দরজায় কড়া নেড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলাম তখন হয়তো সবে আড়াইটে হবে।

পরদিন সকালে যখন জ্বর নিয়ে ঘুম ভাঙলো তখন বেলা এগারোটা বাজে। জ্ঞান হারিয়ে কী করে যে জ্ঞান এসেছিলো, কখন ঘুমোলাম কিছুই জানিনা।বলা বাহুল্য মা বাবা খুব চিন্তিত ছিল আমাকে নিয়ে। বকতেও পারছে না।
এদিকে ঠাকুমা এসে অন্য মাকে এক ঘটনা শোনালো। আমি তো শুনে অবাক!
ব্যাপারটা হলো, কাল থেকে নাকি নিতাই মন্দিরে ফেরেনি। আজ সকালে তাই তার খোঁজ করতে অমল ঠাকুরের ছেলেরা আরও কিছু লোক নিয়ে সেই শ্মশানে গিয়ে দেখে যে নিতাই মাথায় হাত দিয়ে তারই ছেলের মৃত দেহের সামনে বসে আছে। মুখ দিয়ে গেজা ঝরেছে হয়তো, তার চিহ্ন স্পষ্ট।সর্বাঙ্গে শাঁখের গুঁড়ো মাখা,পরনে ধূতি, পাশে রাখা এক খন্ড কালো কাপড়, হয়তো মাথা ঢাকা দিতে লেগেছিলো, হাঁটু থেকে ঢাকার জন্য আরো দু খন্ড কালো কাপড় পরে ছিল। এই সেই

কালকের ব্রম্মদৈত্ত!
একটু ভেঙে বলা যাক।নিতাই অপদেবতা প্রমান করতে তার ছেলেকে কাজে লাগিয়েছিল। ছেলেও সে সুযোগ বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। বিশেষত তার ভয় ভীতি একটু কম ছিল। আর তাই তার বাপের কথায় রাত হতেই সারা গায়ে শাঁখের গুঁড়ো মেখে তিনটে কালো কাপড় নিয়ে শ্মশানে চলে যায়। তারপর মুখ আর হাঁটু পর্যন্ত কালো কাপড় পরে পুকুরের ওপারে ওই অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকে। নিতাইয়ের অট্টহাস্যর সংকেত পেয়ে সে ব্রম্মদৈত্ত রূপে সামনে আসে। কিন্তু জঙ্গলে যে অন্য প্রাণী থাকতে পারে সেই সাবধানতা হয়তো ভুলে গেছিলো। আর তাই হয়তো বা কোনো এক বিষাক্ত সাপের শরীরে পা পরে যেতেই সেও সেই কৃত্তিম ব্রম্মদৈত্তর পায়ে দাঁত বসিয়ে পালায়। "বাবা গো" শব্দ তা এখন যেন বড় কানে বাজতে লাগলো। তখন যেটা মাথাতেই আসেনি। ব্যস, সব শেষ।

যারা কালকে অজ্ঞান হয়েছিল, এমনকি অমল ঠাকুরের ছেলেরাও শোকার্ত নিতাইয়ের সামনে বীরত্ব ফলাতে লাগলো। অমল ঠাকুরও এর জন্য একমাত্র নিতাইয়ের নির্বুদ্ধিতা কে দায়ী করলেন, আর রাগে তার জজমানি

চাকরি কেড়ে নিলেন।

নিতাই তার মৃত ছেলেকে আরো কিছু লোকের সাহায্যে ওই শ্মশানে পোড়ালো।কিন্তু তারপর থেকে নিতাইকে আর কেউ দেখতে পেলোনা। অথচ বাড়ির সব আসবাব পত্র, কাপড়জামা এমনকি তার সাধের কালী মূর্তি টি পর্যন্ত রয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরলোনা।

মাস খানেক বাদে সে নাকি একটা চিঠি লিখেছিলো অমল ঠাকুরকে। তাতে সে নিজের সব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিলো। কিন্তু আর যে সে ফিরবে না সেটাও বলেছিলো।বৃদ্ধ অমল ঠাকুর সে চিঠি পরে চোখের পাতা ভিজিয়েছিলেন বলে শুনেছিলাম। তবে আজ অবধি সেই নিতাই চক্রবর্তীকে ভুলতে পারিনি। সেই হাসি ভরা মুখ, সেই বিচিত্র মুখাবয়ব, সেই মন্ত্রোচ্চারণ,আর তেমন খুঁজে পেলাম কই?জানি অন্যায় করেছে নিজের ছেলেকে দিয়ে। তবু মানুষটা বড়ই দুর্লভ যে!তাই আজও এই কালী মায়ের সামনের আসনটি দেখলে অজান্তেই মনটা কেমন যেন করে ওঠে; মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

C/O Sir

আবীর রায় চৌধুরী

আজ সকাল থেকেই প্রচন্ড বৃষ্টি। সাথে ,থেকে থেকেই চলছে মেঘের ডাকাডাকি। ছুটির দিন রবিবারে , এমন বৃষ্টি কজনের ভালো লাগে জানা নেই ,তবে সুগতর দারুণ লাগে!

ঘন কালো মেঘ ধীরেধীরে ফ্ল্যাটগুলির মাথার উপরে এসে সমস্তটাকে যেন গ্রাস করছে। সাত তলা উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বৃষ্টির ঝরে পরা দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত মাদকতা তৈরি হয়।বৃষ্টির ছাট আটকাতে কাঁচের উইন্ডো টা টেনে দেয় সে।

দুর থেকে চোখে পরা পান্থকলাগাছের পাতাগুলি যেমন , বৃষ্টি ও হাওয়ার দাপটে এলোমেলো হচ্ছে,সুগতর মনও আজ এমন কলাগাছের পাতাগুলির মতই বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বারবার নানান চিন্তার দাপটে.....

উইন্ড চ্যামের টুংটাং আওয়াজ,পর্দা দোলা ,আর এই এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও অবসর , সুগতর কিছুক্ষণ চিন্তা বন্ধ করে দিয়ে ,তাকে অতীতের ফেলে আসা দিন গুলিতে ক্রমশ: নিয়ে আসছে....

সুগত রায় চৌধুরী ,পেশায় ইন্জিনিয়ার। এখন কাজের

সুত্রে ব্যাঙ্গালোরে পোষ্টিং। বছর দুই তিন হল এই ফ্লাট টি কিনেছে। এখনও অবিবাহিত। বয়স এই ত্রিশ ছুঁই ছুঁই।

সুগত ভালো ছাত্র ও অধ্যবসায় থাকায় খুব তাড়াতাড়িই ভালো চাকরী , আবাসন সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পেরেছে। সারাদিন তো কাজের মধ্যেই কেটে যায়, তবে ইদানিং সে লক্ষ্য করছে পুরোনো অতীতের কথা বা ফেলে আসা দিন গুলি যেন চিন্তা করতে ভালো লাগছে। কেন এমন হচ্ছে? কদিন আগেও তো এমন হতো না।

হয়ত বয়স বাড়ছে বলে! বয়স ও মনের এক অদ্ভুত খেলা চীরকাল চলে। যত বয়স বাড়ে মানুষ হতে থাকে একা , বিশেষত: মন হয়ে যায় একা। বন্ধুরা হয়ে যায়, সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত ,প্রিয়জনরাও একে একে মারা যেতে থাকে। মনের খোরাক মিটবে কি করে? যত বয়স বাড়ে মনের অ্যাডভেঞ্চার বা কিছু খোঁজাও বন্ধ হতে থাকে। জীবনের রহস্য আলগা হতে থাকলে, জীবন সম্পর্কীত কৌতুহল ফুরোতে থাকে। আসলে মন হল কিছুটা নদীর জলের মতন ,খুঁজে বেড়ায় তার চলার

পথের ঢালু জমি ,এখন কোনও কিছু না পেয়ে সেই ফেলে আসা দিন গুলির চেনা পথেই একেঁবেঁকে বয়ে যেতে চাইছে। যদিও সুগতর কম না হলেও অনেক বয়স হয়নি ,এখনি শুরু হল এসব!!হয়ত শুরুর বয়স সে পেয়ে গেছে...

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুগতর মনের বায়োস্কোপে একেবারে শুরুর দিন গুলি ভেসে ওঠে। সামনের কাঁচের উইন্ডো তে ব্যাঙ্গালোরের বর্ষনক্লান্ত ছবি যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে ,তার বদলে,ফুটে উঠতে থাকে লালচে প্যান্ট ও সাদা জামা পরা অবস্থায় প্রাইমারী স্কুলে যাওয়া । দশটাই ছুটির ঘন্টা বাজলেই ছুট্টে একসাথে বেড়িয়ে আসা,কে আগে বেড়োতে পারে সে জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দরজায় ব্যাগে ব্যাগে টক্কর...এরপর এক এক করে ক্লাস ,একরাশ কষ্ট বুকে রেখে হাইস্কুল, তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ,প্রথম চাকরি , প্রথম স্যালারী । পরপর চলতে থাকা স্মৃতি তে যুক্ত হয় প্রথম প্রেম ,সেই গোলাপী বিকেল বেলা,প্রথম হাতে হাত রাখা ও প্রথম দুটি ঠোঁটের মিশে যাওয়া এবং বান্ধবী বিপাশার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে প্রথমবার সঙ্গমে মিলিত হওয়া ,এরপর গোলাপের শুকনো পাপড়ি ঝরার

মতন যেমন সকলে ওর জীবন থেকে হারিয়ে যায় ,তেমনি বিপাশাও একদিন ঝরে পরল।
কিন্তু এসব কিছুই শুরু ও শেষ হয়েছিল ।সমাপতন ঘটেছিল ।বহুবার সে অনুভব করেছে উনিশে যাকে মনে ধরেছিল বা তার মন একদম পাগল করেছিল ,উনত্রিশে এসে তার সাথে কথা বলে এমন কিছুই আর মনে হয়নি, কেন যে তখন ওমন হয়েছিল, কে জানে। কিন্তু এসব ভিন্ন কিছু একটা স্মৃতি রয়ে যায় মনে যেটি ছোট গল্পের মতন "শেষ হয়েও হইল না শেষ "। সুগত অনুভব করে কোন একটি ঘটনা যেন সে আস্বাদ নিতে শুরু করতেই শেষ হয়েছিল। গলায় কাঁটা ফুঁটলে যেমন বারবার কিছু খেলেও ,সেই কাঁটা জানান দেয় সে এখনও যায়নি ,সেইরকম ফিল্ করতে থাকে সুগত ও বারবার চেষ্টা করে কোথায় আটকাচ্ছে সে...
ধীরেধীরে মনে ফুটে ওঠে একটি হলদেটে দোতলা বাড়ি। এরপর এক এক করে ফুটে ওঠে সেই বাড়ির দোতলার ঘরে ওঠার সিঁড়ি ,বেশ ছোট ছোট সিঁড়ি । হুমম মনে পড়ছে ক্লাস এলেভেন্ । ওই বাড়িটাই ছিল তখন একরাশ সুখের ঠিকানা। শতরঞ্চি পাতা অবস্থায় জনা সতেরো জন ওরা বসত । সামনে থাকত স্কুল ব্যাগ । কথা বলতে বলতে যখন সবাই হেসে গড়িয়ে

পড়ত তখনই ,একটি ধমক দরজার বাইরে থেকে আসত. " বেশি উড়ো না এই বয়সে ,পরে গিয়ে লাগবে ,বুঝলে"..
এরমই বলতে বলতে যিনি ঘরে প্রবেশ করতেন ,তিনি সুগতদের প্রিয় বাংলা স্যর। ভাল নাম রোহীত ব্যানার্জী। তখনও কারো হাসি থামতো না,রতন বলে উঠত "স্যর আজকে খাওয়াবেন?"
"চোওওওওপ!!"
" যা যা পড়া দিয়েছি ,দেখে নে ..একটু পরেই টুইলভের ব্যাচ ঢুকে পরবে"...
রোহীত স্যর! ক্লাস টেন থেকে সুগতরা পড়ত ওনার কাছে । নির্ভেজাল আড্ডা ও পড়ার উচ্চকৌশল মিশিয়ে জমিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কোচিং।
স্যর গল্প বলতেন ,জানাতেন পৃথিবীর আশ্চর্য সব রহস্যের কথা ,। মুগ্ধ হয়ে থাকত সবাই ,তার সেই বলার ভঙ্গিমা তে। এরসাথে চলত ওই বয়সের সাথে মানানসই কিছু ইয়ার্কি । যেমন রুদ্রাণীর সৌম্য কে পছন্দ হয়, স্যর কোনওভাবে সেটা লক্ষ্য করেছিলেন বা জেনেছিলেন। একদিন বিয়ে টিয়ে নিয়ে কথা চলছিল ,স্যর হঠাৎ হেসে বললেন "রুদু তোমার জন্য কোনও সৌম্যকান্তি বর ই আছে,চিন্তা করো না"...

সবাই তো পারলে হাসতে হাসতে পেট ফাটিয়ে ফেলে ।আসলে স্যর কিন্তু ভীষন আধুনিক ছিলেন ,ওই মোটা ফ্রেমের চশলাওয়ালা বা মোটা গোঁফওয়ালা ছিলেন না ,হালকা ফ্রেমের চশমা পরতেন ,আর হাল্কা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ,ডেনিম জিন্স ও গোলগলা টি সার্ট পরতেন । বয়স এই এখন সুগতরই মতন ছিল ,ত্রিশ ছুঁইছুঁই। সুগতদের ব্যাচে বেশ কিছু মেয়ে বেশ ক্রাস খেত স্যরের প্রতি । হওয়ারই কথা এতসুন্দর দেখতে স্যর ,তেমনি সুন্দর কথা বলেন ,প্রেমে পরাতো সহজাতই। স্যর কিন্তু সবই বুঝতেন , কিন্তু কোনওদিন লিমিট ক্রস করেন নি । স্যর রেলিশ্ করতেন আর হাসতেন । তবে দুটি বিষয়ে স্যর বেশ স্ট্রিক্ট ছিলেন ,পড়া না পারলে ভীষণ বকতেন আর একটা হল মাস পরলে মাইনে দিতে দেরী হলে চেয়ে নিতেন ,অনেকসময় বাড়িতেও চলে আসতেন । তবে তিনি বলতেন দেখ আমি লোভী নই ,তবে এটাই তো আমার রুজিরুটি ,তাই মাইনে মারার চেষ্টা করো না,তাহলে কিন্তু ছাড়ব না ।এটাও সত্যি ওই অতবড় বাড়িতে স্যর একায় থাকতেন। সুগতদের পড়ানোর বছর চার পাঁচ আগে স্যর বাবা ও মা কে হারান। আর আত্মীয়স্বজন কাউকে আসতে সুগতরা দেখেনি , খারাপ সময়ে সবাই দুরে

চলে যায় ,হয়ত স্যরেরও তাই হয়েছিল। অথবা হয়ত শুধু টিউশন করেন ,চাকরী পাননি তাই সবার থেকে দূরে রাখতেন,বলা তো যায়না কে কিভাবে অকস্মাৎ অপমান করে দেয়। কিন্তু সুগত রা ছিল স্যরের সবচেয়ে আপনার জন,হয়ত স্যর জানতেন এরা ভালবাসা আর শ্রদ্ধায় দিতে পারে ,সভ্য মানুষের অসভ্য দংশন নয় মানে বেকার টেকার বলে ডাকা আরকি!
যাই হোক এভাবেই খুশি খুশি তে চলছিল ক্লাস ইলেভেন ,সমস্ত পড়ার ক্লান্তি যেন, এখানে এসেই শেষ হতো।
সেদিনও মঙ্গলবার ,ঘুম থেকে উঠে সুগত ভেবে খুশি হয়,আজ সন্ধ্যায় রোহীত স্যরের ব্যাচ আছে!!
সমস্ত পড়া করে দুপুরে খেয়ে যখন ঘুমাবে ঠিক করেছে ,এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বাবা বললেন "সুগত, সর্বনাশ! হয়েছে !!"

"কি হয়েছে বাবা ?"

" তোদের রোহীত স্যর ,কাল গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, আজ সকালে , হাসপাতালে মারা গেছে!!!
একমুহুর্তে সব যেন ওলটপালট হয়ে যায় ।কখন

অজান্তেই কিশোর সুগতর চোখ বেয়ে নেমে আসে এক বিচ্ছেদের বেদনাঘন অশ্রু.....স্যর নেই ইইই!!!!

সন্ধ্যায়, বৃষ্টি মাথায় করে সবাই জড় হয় স্যরের বাড়ির সামনে ,একটি খাটে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন রোহীত স্যর।

অনেকেরই সজল চোখ। সৌমেনের মা চোখে জল এনে বলে আহা! বাপ মা মরা ছেলে টা অযত্নেই চলে গেল । সুগতরা কোনও রকমে কান্না আটকে স্যরের পায়ে ফুল রেখে শেষ নমস্কার জানালো । ধীরেধীরে স্যর কে কাঁধে নিয়ে কিছুজন দুরে আরও দুরে, একবারেই অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। রোহীত স্যর এর ব্যচ শেষ না হতেই সমাপ্ত হল ।সুগতর মনে আছে সে মাসের টাকাটা দেওয়া হয়নি এবং আর দেওয়া হলনা। কোথায় হারিয়ে গেলেন অতপ্রাণচঞ্চল স্যর?..... তারস্বরে বারবার কেউ কলিংবেল বাজাচ্ছে ,চেতনা ফিরে পেল সুগত। কোন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে, চোখের সামনে পুনরায় ফুটে উঠেছে ব্যাঙ্গালোরের বৃষ্টিভেজা সকাল বেলা। চোখ রগড়ে দরজা খুলে দেখল লালচে ইউনিফর্ম পরিহিতা জ্যোমাটো গার্ল

দাঁড়িয়ে।

"Sir your order"

হুমম !বলে খাবারের পার্সেলটা হাতে নিল সুগত।

Sir ,pls give us rate and bye sir"

হুমম ,ok ,বলে দরজা বন্ধ করে দেয় সুগত।

স্নান সেরে খেয়ে নিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে কাজে বসে সে।

পরেরদিন "bloody khuni monday" শুরু ,মানে চাকরী করেন যারা তাদের কাছে সোমবার হল সবচেয়ে অশুভ একটি দিন , রবিবারের অবসর না কাটতেই চলে আসে।

শুরু হয় আবারও একই জীবন ,একই রেস্ ,নুতন প্রজেক্ট নূতন ডিলিংস্...হারিয়ে যেতে থাকে কোনও রবিবারে down the memory lane এ হাঁটা দিন গুলোর কথা।

অসংখ্য রবিবার আসে যায় ,সুগত কাজে আরও ব্যস্ত হতে থাকে ।
হঠাৎই একদিন ওয়েস্টবেঙ্গল এ কিছু কাজ করবার ফুরসৎ পায় সে।
"যাক বহুদিন পর , বেঙ্গল এ যাবো " ভাবে সুগত। সেই মোতাবেক প্লেনের টিকিট রিজার্ভ করতে বসে সে । করতে করতে সুগত ভাবে " আচ্ছা এবার একটু অন্যভাবে যাওয়া যাক না!.. ট্রেনে? না সেতো এখন বন্ধ ,ও না না খোলা আছে , কিন্তু.. ধুরর নিজেই ড্রাইভ করে যাব "

সোমবার এক ঝকঝকে দিনে ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে ,সাদা চেক জামা ইন করে ,নিজের কালো সুইফট্ ডিজায়্যারটা নিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ড্রাইভে মানে সো লং ড্রাইভে বেরোলো সুগত। গুগল্ ম্যাপ ঠিক করে নিয়েছে , কয়েকটা হোটেলও বুক করে নিয়েছে ।
বেশ ভালোভাবেই গাড়ি চালিয়ে প্রায় দুহাজার কি.মি পথ অতিক্রম করে ,একবার গাড়ির চাকা পাল্টিয়ে ভুবনেশ্বর হয়ে যখন বাঙলায় যখন ঢুকল তখন দুপুর পেরিয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনও অনেকটা

পথের পর ওঁর বাড়ি । কোলকাতা থেকে বেশ দূরে , মফস্বলে ওঁর বাড়ি।
মাঝে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে একটু চা খেয়ে নিতে নিতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল । কোনওরকমে গাঁড়িতে উঠে স্টার্ট দিল । ধীরে ধীরে দশটার কাছাকাছি তার মফস্বল পাড়া গাঁ এর কাছাকাছি সে পৌছালো। বৃষ্টি এখানেও বেশ চলছে । সাথে বিদ্যুৎ চমক ও বাজ ও পড়ছে । উইপার টা বেশ সজোরে চলতে চলতে যেভাবে বৃষ্টির জল মুছে দিচ্ছে ,তেমনভাবেই ছোটবেলার পাড়ার স্মৃতিগুলো আরও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে সুগতর। মুখে একটা মিষ্টি হাসি এনে রিমঝিম গিরে সাওন" গান টা গাইতে গাইতে ওদের পাড়ার কাছাকাছি আসতেই ওর ইচ্ছে হল একটা সিগারেট খাওয়ার । চলন্ত অবস্থায় সিগারেট ধরাতে সবে যাবে,এমন সময় গাড়ির সামনে একটা কুকুর জাতীয় পশু চলে আসায় অতর্কিতে বসে ব্রেক কষতে চাই কিন্তু ,ঠিক মতো সামলাতে না পারায় গাড়িটা প্রচন্ড শব্দ করে ঘুরে গিয়ে অনেকটা এগিয়ে বেশ জোরে একটি বড় গাছে গিয়ে ধাক্কা দেয় ও থেমে যায় এবং সাথে সাথে একটি বড় হর্ণ বেজে ওঠে।
এরপর সব ব্ল্যাকআউট!!!!!!!!!!
....মিনিট দশেক পর সুগত যখন চোখ খোলে তখন

বোঝে তার মাথাটা স্টিয়ারিং এর ওপর রয়েছে আর বুকে বেশ! লেগেছে ।

চোখ রগড়ে গাড়ির আলো জ্বালিয়ে দেখল গাড়ির সামনে টা দুমড়েছে। তবে ওর বেক্তিগত চোট তেমন অনুভূত হলো না।

বৃষ্টি টা এখন বেশ ধরেছে। গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে টা বেশ দেখা যাচ্ছে । ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজ ও ব্যাঙের কলতান শুরু হয়েছে। জায়গা টা ভালোভাবে ঠাওর করতে কাঁচ টা নামাতেই সুগত লক্ষ করে সে একটি বাড়ির সামনে রয়েছে । আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। বাড়িটি দোতলা।দূরের একটি স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোতে এই জনাকীর্ণ বাড়িটির দৈন্যদশা বেশ বোঝা যাচ্ছে । পলেস্তারা খসে পড়েছে , অশ্বত্থ এর চারা আরো আগাছা ঘিরে ধরেছে।
" আরে এটা তো রোহীত স্যর এর বাড়ি...

কি অবস্থা হয়েছে!!"...মনে মনে বলল সুগত।

এরপর গাড়ি থেকে নেমে সেই বাড়িটির দিকে এগিয়ে

চলল সুগত ।

মাঠের জল কাদা পার করে যখন বাড়ির সামনে এল তখন আবার বৃষ্টি শুরু হল।
এ বাড়ির আনাচে কানাচে সবই সুগতর চেনা। এক দৌড়ে বাড়িটির রোয়াকে উঠে এল সে।
বুকের ব্যাথা টা এখনও আছে সুগতর ,একটু আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে ,সেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো । ধুমো গুলো গোল গোল করে ছাড়তে ছাড়তে সেই রবিবারের কথা গুলি ভাবতে লাগল । পনের ষোলো বছরে কি অবস্থা বাড়িটার । পলেস্তারা খোসে,হলুদ রং হারিয়ে একটি বিবর্ণ রূপ নিয়েছে । রোয়াকের আশপাশ দিয়ে ঘণ আগাছার জঙ্গল । সবচেয়ে বড় কথা আশেপাশে বাড়িও তেমন নেই ,ঠিক যেমন তখন ছিল । মফস্বল জন্যই হয়তো নেই , শহর হলে কবে আবাসনের জঙ্গলে ভরে যেত। এইসব সাঁতপাঁচ যখন যে ভাবছে ,তখনই মনে হল কোথাও দুর থেকে কিছু জনের কলরব শোনা যাচ্ছে। আশেপাশে তো তেমন বাড়ি নেই তাহলে?

বর্ষাকালের বাতাস নানা দিক থেকে বইছে ,ফলে কোন

দিক থেকে আসছে ঠিক ঠাওর করতে পারছিল না সুগত। রোয়াকের সিড়ি বেয়ে নেমে বাড়ির উত্তর - পশ্চিমের দিকে তাকাতেই মনে হল শব্দের জোর আরও বেড়ে গেছে । কিন্তু ওদিকে তো পুরো জঙ্গল। কিভাবে পার হয়ে ওখানে যাবে ? সিগারেট টা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদিকে.....

হঠাৎই একসাথে বেশ কয়েকজনের " হা হা হা হা হা হা" এরম হাসির আওয়াজ পেয়ে সুগতর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল ।

সকৌতূহলে মোবাইলের টর্চ জ্বেলে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি মাথায় করে সেই আগাছার জঙ্গল ভেদ করে বাড়ির ভেতর কার দিকে আসতেই দেখল সেই টিনের দরজা টা ভেঙে পড়ে আছে ,সেটি পার করে উঠোণে এসে দাঁড়ালো । কামিনী ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে ,পা টিপে টিপে পিছল বাঁচিয়েই সে উঠোনে এসছে। নিঃঝুম নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি টি। স্যর চলে যাওয়ার পর এভাবেই দাঁড়িয়ে । সাপখোপ ,ব্যাঙ আর মশার রাজত্ব হয়েছে ।
কিন্তু আওয়াজ আসছিল কোথা থেকে?

কিন্ত কিছুক্ষণ থেকেও আর কোনও আওয়াজ সে পেলনা। নীচের ঘরগুলির দিকে টর্চ ফেলে দেখে নিয়ে ফিরে আসতে যাবে ,তখন আবারও সেই সমবেত হাসি শুনতে পেল , অল্পবয়সী কিশোর কিশোরী দেরই হাসি ।

চকিতে! উপরে তাকাতে সুগত দেখল দোতলার সিড়ি ও লম্বা বারান্দার মাঝের তাদের পড়ানোর ঘরটা থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে । আর মনে হচ্ছে এখানে থেকেই আওয়াজটা আসছে। উঠোন থেকেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। উঠতে গিয়ে পুরোণো অভ্যাসে সুগতর মনে পরে সিড়ি গুলো ভীষণ খাঁড়া ও ছোট ,ফলে সাবধানে উঠতে থাকে ,যত ওঠে তত ওদের সমবেত কন্ঠস্বর স্পষ্ট হতে থাকে...

" রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা --
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত, ..."

"বীরপুরুষ পড়ছে ! কিন্তু এখানে এখন কারা পড়ছে ? আর যদি কেউ থাকে তাহলে এত জঙ্গল কেন?"...এসব প্রশ্ন ঘুরতে থাকে সুগতর মাথায় । সিড়ি পার করে যখন ওপরে ওঠে তখন আবার সব শান্ত । লম্বা বারান্দা ঘন অন্ধকার তবে ,সিড়ি ও বারান্দার মাঝের ঘরটি থেকে তখনও আলো আসছে । সুগত এগিয়ে দেখে ঘরটির কাঠের দরজা হাল্কা ভেজানো। আশপাশ এতটাই নির্জন যে সুগত নি্জের নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল । সিড়ি দিয়ে উঠতে হাফিয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে দরজার কাছে গেল এরপর হাতটা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সে দেখল শতরঞ্চিতে বসে আছে ষোলো সতেরজন তরূণ তরূনী ।সবাই বইয়ের পাতায় নিমগ্ন । যেন ওকে কেউ দেখেয়নি ,জানেও না সুগত এসেছে ,এরা কারা? এবার ওদের একটু ভাল ভাবে প্রতক্ষ করতে গিয়ে সুগতর পিঠ দিয়ে ঠান্ডা হিমস্রোত বইতে লাগলো।মনে হল সমস্ত দেহে যেন কারেন্ট বইছে।

সুগত দেখল যারা বসে আছে ,সবাই ওর চেনা.. সৌম্য ,শাওনি , রুদ্রাণী , নবনীতা , রিয়া ,সন্দীপ ,রতন ....এরাই তো ক্লাস ইলেভেনের ব্যাচ। আর সবচেয়ে অদ্ভুত হল এদের সকলের মধ্যে হাল্কা ছাইছাই রঙের

জামা পরে ওদেরই বয়সী সুগত নিজেই বসে আছে ।
তারও মুখ বইয়ের পাতায় নিমগ্ন।
এরপর সবাই একলয়ে ধীরেধীরে সুগতর দিকে
তাকালো !!

বিস্ফারিত চোখে ও অকস্মাৎ এই অভূতপূর্ব ঘটনায়
কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুগত চিৎকার করতে গিয়েও দেখল
গলায় স্বর হারিয়ে ছে সে !!..

এমন সময় তীব্র বাজ পরার সাথে সাথে সুগত যেন
চেতনা ফিরে পেল ও নিজেকে একটি অন্ধকার ঘরে
আবিষ্কার করল।
তাহলে এতক্ষণ কি দেখল সে????
একটু ধাতস্থ হয়ে মোবাইলে জ্বালতে গিয়ে দেখল ,
চার্জের অভাবে সুইচড্ অফ হয়ে গেছে।
কোনওভাবে সেখান থেকে বেড়িয়ে সিড়ির দিকে সব
পা বাড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ শুনল তার অতিপরিচিত
কন্ঠস্বর...
" সুগত আমার টাকাটা এনেছিস?"
পেছনে ফিরতে সুগতর মনেহল বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে
, হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকানোয় সে দেখল ঘাড় বাঁকা রক্তাত্ব

অবস্থায় স্বয়ং রোহীত স্যর দাঁড়িয়ে ,আর সেই রক্ত মাখা হাত টি সুগতর দিকে বাঁড়িয়ে দিয়েছে।ওরে বাবাগো.....বলে তারস্বরে চিৎকার করে কোনরকমে সিড়ি দিয়ে নেমে সুগত পালাতে থাকে। কিন্তু সহসা ঘটনায় সে বারংবার বেরোনোর পথ ভুল করতে থাকে ,শেষ পর্যন্ত পাঁচিল টপকে এক ছুটে গাড়ির সামনে এসে এক ঝটকায় গাড়ির দরজা খুলে দেখে তারই মতন সাদা চেক জামা পরে কেও স্টিয়ারিং এ মাথা গুঁজে রয়েছে।

" এএ কে আপনি ,সরুণ বলছি " বলে সেই লোকের হাত ধরে টান মারতেই লোকটি পরে যায় ,...

স্টিট ল্যাম্পের আলোয় সুগত দেখে পরে যাওয়া মানুষ টি আর কেউ নয় ,সেটি তারই দেহ!!!!!!!!!

"এটা কি হচ্ছে আমার সাথে" বলে চিৎকার করে ওঠে সে।

এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে সে শুনতে পায় ..

" বৃষ্টি তে ভিজিস না সুগত ,এদিকে আয়..

তোর কাছে থেকে মাইনা নেওয়া বা তোর মাইনা দেওয়া ,দুইয়েরই প্রয়োজন আমরা দুজনায় হারিয়েছি"...

সুগত লক্ষ্য করে দুরে ছাতা হাতে সেই ছোট্ট বেলার

সৌম্যদর্শন রোহীত স্যর দাঁড়িয়ে। কোনও বিকৃতী আর নেই.....
বৃষ্টি র দাপট আরও বেড়ে চলেছে। সুগত দৌড়ালো স্যর এর দিকে.....।

নীলাক্ষী লজ
রাজেশ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে তো এমন অনেক ঘটনাই ঘটে; যেগুলোর কোনো যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখা আমরা কোনোদিনই ঠিক ভাবে করে উঠতে পারিনা ।দুঃস্বপ্ন ভেবে সেগুলোকে ভুলে যাওয়ায় শ্রেয় ।যাইহোক দার্শনিক আলোচনা একটু দূরে সরিয়ে রেখে এবারে আসলে কথাতে আসি ||

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে 2011 সালে ইংরেজিতে স্নাতক করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. -এর জন্য ফর্ম ফিলআপ করতে গেছিলাম ।প্রচন্ড গরমের মধ্যে যখন ওখানে গেলাম; তখন দেখলাম কয়েকটা পৃথক ভাবে লাইন করা হলেও প্রতিটাতেই অনেকজন দাঁড়িয়ে ।তারপরে বেশ কয়েক ঘন্টা লাইনে থাকতে-থাকতে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি তখন ফর্ম হাতে পেয়ে আবার সেটাকে তখনি ফিল-আপ করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিলাম ।তাতে ফর্ম সাবমিট করতে-করতে আরও দেরি তো অবশ্যই হয়ে গেল আর সেই সাথে পেটের মধ্যে খিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখলাম ।

ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায় পড়ন্ত আলোতে কয়েক-পা হেঁটে যখন কোনো-মতে আমার শরীরটাকে একটা ঝুপড়ি মতো হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফেললাম তখন হোটেলে কেউই বসে নেই আর একটা কালো-ছেঁড়া গেঞ্জি পড়া রোগা-পাতলা ছোট-ছেলে লাগোয়া সামনের রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা জলের বালতি নিয়ে বসে এঁটো থালা গুলোকে ছোট্ট ভিজে কাপড় দিয়ে একমনে গুন-গুন করতে করতে পরিষ্কার করে পাশে রেখে দিচ্ছে আর মাঝে-মাঝেই ওখানে ঘোরা-ফেরা করা একটা পাগল লোককে অশ্লীল খিস্তি করে চলেছে ।একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পড়ে যে লোকটা কাউন্টারে বসে ঘ্যাম নিয়ে হাত-পাখা নাড়ছে; এইই বোধহয় মালিক ।

-"এখন ভাত হবে?"

-"তা হোটেলে ভাত হবেনা? বসে পড়ুন "

যদিও এতক্ষন ধরে পিঠের ভারী ব্যাগটাকে পাশে রেখে বসে আগেই পড়েছিলাম ; ভাবলাম খালি-পেটে মাথা থেকে হাইজিনের চিন্তাগুলো বোধহয় ভিক্টরিয়া-মেমোরিয়ালে ঘুরতে যায় !

-"কি খাবেন? মাছ না চিকেন?"

-"মাছ"

-"এইই ! এখানে একটা মাছ-ভাত "
খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন হাত-ধুচ্ছি তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার ঘাড়ের কাছে কে যেন নিঃস্বাস ফেলছে ! ।পেছন ঘুরেই বেশ হক-চকিয়ে গেলাম । দেখলাম সেই পাগলটা; ধুলো-মাখা আলু-থালু চুল; পরনে বোধহয় একটা 1947 সালের ময়লা জামা; এক দৃষ্টিতে আমার দিকে লাল-লাল চোখে তাকিয়ে আছে । ঠিক তখনি একটা ফোন এলো ! ।দেখলাম বাবার ফোন ।হোটেলের বিল পেমেন্ট করতে-করতে ফোনটা রিসিভ করলাম ।
-"হ্যাঁ ! বলো !"
-"খেয়েছিস?"
-"এই মাত্র খেয়ে উঠলাম আর তোমার ফোন"
-"ফিরবি কিভাবে? "
-"মানে? "
-"অবরোধ আবার শুরু হয়ে গেছে ! হয় ট্রেন চলবেনা বা এলেও প্রচুর লেট হবে ! তাহলে আজকের রাতটা ওখানে কোথাও থেকে যা" ।বাবা একটানা কথাগুলো বলে গেলো ।

-"আচ্ছা ! বেশ বেশ ! আমি দেখছি কি করা যায় !

তোমাকে জানাচ্ছি আমি" ।ফোন কেটে দিয়ে বন্ধু দেবোত্তম কে একটা ফোন করলাম; ওর বর্ধমানে অনেক জানা-শোনা ।

-"বল রে !"

-"শোননা ! বলছি আজকে বর্ধমান এসেছি; তোর জানা কোনো ভালো লজ আছে? "

-"বোকার মতো কথা বলিসনা ! গোলাপবাগে থাকার প্রচুর লজ আছে ।কম খরচে যে-কোনো একটাতে থেকে গেলেই তো হলো ||"

ফোন কাটা মাত্র কে যেন কানের কাছে বিকট ভাবে চিৎকার করে উঠলো;

-"ঘার লট যা ! আভি কে আভি.. . ঘার লট যা ! রুকনা মাত.. রুকনা মাত"

শালা ! পাগল ! আরেকটু হলে বোধহয় আমার ব্রেনেই হার্ট-এটাক হয়ে যেতো !

সাত-পাঁচ না ভেবে হাঁটতে লাগলাম; আজকের রাতটা কোনো হোটেলেই কাটাবো বলে ।

রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা দূর যেতেই দেখতে পেলাম একটা চায়ের দোকান; দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপরে তিন-চারজন চা খাচ্ছে ।আর চায়ের

দোকানের ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বেই যেটা দেখলাম সেটা দেখে মনটা বেশ-বেশ ভালো হয়ে গেলো ।একটা সাইন-বোর্ডে লেখা "নীলাক্ষী; ফুডিং এন্ড লজিং" ।আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম । শুনতে পেলাম; আমার পেছনে ফেলে আসা চায়ের দোকান থেকে কেউ বা কারা যেন বার-দুয়েক চেচিঁয়ে উঠলো; "এই ছেলে.. . এইই ছেলে.. .ওদিকে কোথায়.. . " ।বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ।

ভেতরে ঢুকে সামনে বসা হোমড়া-চোমড়া লোকটিকে বললাম;

-"আজকের রাতটা থাকবো; কত পড়বে? "

মধ্যবয়সী লোকটার পরনে একটা সাদা-মাটা সুতির জামা; চোখে একটা অদ্ভুত ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা; মাথায় চুলের সংখ্যাও বেশ কম। কিন্তু কি দারুণ ভাবে পকেট থেকে চিরুনি বের করে সেগুলোকে একবার আঁচড়ে নিয়েই; দাঁত বের করে এক গাল হেসে বলে উঠলো;

-"স্যার! 300 টাকা মাত্র"

-"রাতের খাবার পাওয়া যাবে? "

-"অবশ্যই ! অবশ্যই ! এই নিন আপনার চাবি; রুম

নম্বর 11; ওপরে উঠে একদম ডানদিকে ।আর এখানে প্লিজ একটা সই করে দিন; পাশে ফোন নম্বর আর এড্রেস লিখতে ভুলবেন না যেন! ।
আমি লোকটার দেওয়া মোটা আর চাপ-চাপ ধুলো-জমা রেজিস্টার খাতাতে লাগোয়া পেনে সই-টই; করে যখন ওপরের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি তখন পেছন থেকে শুনতে পেলাম;
-"স্যার ! আমি একটু বাদে ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি; ও আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবে"

তাহলে এটাই রুম নম্বর 11 ।তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবো; এমন সময় পেছন থেকে গলা পেয়ে কেঁপে উঠলাম;
-"দাঁড়ান স্যার; অন্ধকারে পড়ে যাবেন; আমি আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি "
দেখলাম একটা শ্যামবর্ণ; বছর 15-16'র ছেলে; নিমেষে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিলো ।

-"স্যার! এই পাশের টা ফ্যানের সুইচ"
-"আমাকে স্যার বলার দরকার নেই ।দাদা বলতে পারো ||"

-"আচ্ছা স্যার! ইয়ে ! সরি ! মানে দাদা!"
আমার হাল্কা হাসি পেলো; যদিও সেটা দেখালাম না;
-"তোমার নাম কি? আর তোমাদের এখানে কি ব্যাপার বলোতো? আর কাউকেই তো দেখছিনা ! সব ঘর তালা-বন্ধ!"
-"বাজার খুব খারাপ দাদা; যে চার-জন ছিলো ওরা আজকে দুপুরেই বেরিয়ে গেছে; আবার যখন সবাই কলেজে ভর্তি হবে তখন আবার সব ওকে হয়ে যাবে । ও হ্যাঁ ! আমার নাম পল্টু ।"
-"কলেজ নয় পল্টু; বলো ইউনিভার্সিটি ! ।যাইহোক; রাত্রিতে রুটি-তড়কা হবে? "
-"আমিও এটাই বলতে চাইছিলাম ।হয়ে যাবে দাদা ||"

পল্টু চলে যেতেই আমি দরজা লাগিয়ে একবার বাড়িতে ফোন করে আমার থাকার ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম । এবারে একটু সময় নিয়ে ভালো করে রুমটা দেখলাম । একটা ছোট খাট; সাদা চাদর পাতা; একটা পুচকে বালিশ; পাশে একটা প্লাস্টিকের কালো চেয়ার; লাগোয়া বাথরুম অন্ধকার; সব সুইচ টিপেই দেখলাম আলো জ্বলছে না ! ।এই ভ্যাপসা-গরমে মাথার ওপরে ফ্যানটা আছে আর সেটা প্রয়োজনের থেকে এতটাই জোরে

ঘোরে যে বাইরের একটাও শব্দ শোনা যাচ্ছে না ।
একটা রাত কাটাবার জন্য ঠিক-ঠাকই ।ক্লান্ত শরীর;
ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে সবটাই শেষ করে
কিছু-ক্ষণের জন্য বিছানায় নিজেকে ছেড়ে দিলাম ।
শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম এই রুমের এমনকি লজের
সব আলোগুলোয় বড্ড মিটমিটে আর কেনই বা
ফ্যানের হাওয়াতে দেওয়ালে লাগানো যে ক্যালেন্ডারটা
উড়ছে; সেটা 2008 সালের ! ।

প্রচন্ড গরমে ঘুম ভেঙে গেলো ।যা বুঝলাম তা হলো;
কিভাবে এক ঘুমে রাত্রি কেটে সকাল হয়ে গেছে;
পাশের জানালা দিয়ে বিক্ষিপ্ত গাড়ি চলা-চলের
আওয়াজ; খুব সম্ভবত পাওয়ার-কাট হয়ে গেছে; ঘামে
ভিজে গেছে সারা শরীর; ।আর এই সব কিছুকে
ছাপিয়ে প্রচুর খিদে পেয়েছে ।

নিজেকে গুছিয়ে নীচে নেমে এলাম ।দেখলাম আমার
দিকে লজের মালিক কেমন যেন জিজ্ঞাসু চোখে
তাকিয়ে আছে ।ভাবখানা এমন যেন পাঁচ-তারা
হোটেলের মালিক ।আমার তখন এতটাই বিরক্তি
লেগেছে যে কোনো কথা না বাড়িয়ে বলেই ফেললাম;

-"এই নিন আপনার তিনশো টাকা আর ফর্মালিটিস করার খাতাটা দিন"

-"স্যার! আমি কালকের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত ।প্লিজ বাসি মুখে বেরোবেন না ।এইই লাল্টু স্যারের জন্য পাশের দোকান থেকে জলদি চা নিয়ে আয়।"

-"Hey ! Mr. আপনি ওকে লাল্টু বলে ডাকছেন কেন? " ।ততক্ষনে ছেলেটিও ওখানে এসে হাজির হয়েছে ।"ওর নামতো পল্টু !"

তখন দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে কোনো সংক্ষিপ্ত মহাকাব্য আদান-প্রদান করে উঠলো ।সেই মুহূর্তে; নীরবতা ভেঙে লোকটি রেজিস্টার খাতার শেষের দিক থেকে একটা ফটো বের করে বললো;

-"এর নামই পল্টু ।ওরা দু'জনে যমজ; তবে এর কপালের কাছে এই দাগটা ছিল "

-" ছিল মানে ? "

-"স্যার ! তিন বছর আগে; আমার দাদা আগুনে পুড়ে মারা যায় ! তারপর থেকে আমি যেদিন-যেদিন রাত্রে সার্ভিস দিতে পারিনা; ওইইই দিয়ে দেয় ! ।আসলে আমাদের আজও খুব ভালোবাসে.. .

মাথাটা মুহূর্তে কেমন ঘুরে গেলো ।গলা শুকিয়ে কাঠ । কোনোমতে ওখান থেকে সামনের বড়ো রাস্তার দিকে দৌড় লাগালাম ।নিজের হার্ট-বিট যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছিলাম ।দৌড়াবার সময় পেছন থেকে খুব স্পষ্ট শুনেছিলাম;
-"দাদা খুউব ভালো.. . স্যার.. . স্যার.. ."

-"বল"
-"আবে ! কালকে রাতে 'নীলাক্ষী' বলে একটা লজে রাত কাটালাম.. . কি সাংঘাতিক.. . ওখানে ভূত দেখলাম রে ভাই.. . নিজের চোখে দেখলাম রে দেবু .. .উরিবাপরে ! বাপরে.. ."
-" সক্কাল-সক্কাল নেশা-টেশা করছিস নাকি? কিসব আজে-বাজে বলছিস ! "
-"ধুরর ! শালা ! আমি এইমাত্র ওখান থেকে ভয়ে পালিয়ে এসে বড়ো রাস্তার এদিকে তোকে ফোন করছি!"
-"আজকে বাড়ি ফিরে বিকালে ইরিগেশন-কলোনীর মাঠে দেখা কর ।আমি ভালো করেই জানি; 'নীলাক্ষী' বলে যে লজটার কথা তুই বলছিস; ওটা বছর-তিনেক আগে রেনোভেশনের সময় আগুনে পুড়ে গেছে আর

মালিক-কর্মচারী সবাইই মারা গেছে; কেউ আর বেঁচে নেই.... ... ."

স্পাইনাল কড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো । অবর্ণনীয় অবস্থায় পেছন ঘুরে তাকালাম। একটা খুব বাজে ভাবে পুড়ে যাওয়া পরিত্যক্ত বাড়ি; রাশি-রাশি আবর্জনার মতো নাম-না-জানা গাছ ভেতরের অংশ আর বাইরের মরচে-পড়া ছোট্ট গেটকে শান্ত সাপের মতো জড়িয়ে রেখেছে ।একটা ডানদিক হেলে পড়া আধপোড়া বোর্ডে লেখা; "নীলা.."

রাস্তার ওপর পড়ে যেতে-যেতে শেষ বারের মতো আবছা দেখতে পেয়েছিলাম কারা যেন চায়ের দোকান থেকে চিৎকার করতে-করতে আমার দিকে ছুটে আসছে...

ও কার হাসি

কলমে পিয়ালী রায়

আজকেও সহেলী প্রতিদিনের মতন অফিস থেকে ফিরছে।বাসে বসার জায়গা পেয়ে বসে পড়ল ও। মোবাইল নেটটা ওন করল।সত্যি আজকাল যা খাটুনি যাচ্ছে অফিসে! লকডাউন বলে অনেক কাজ জমে গেছিল কয়েক মাস।এই মহামারীর মধ্যেও ওর অনেক ব্যাচমেট নিয়মিত অফিস করেছে।ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তানিয়া রোজ অফিস গেছে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলে।

কলেজে পড়তে ওদের একটি ছোটখাটো মেয়েদের গ্রুপ ছিল এবং ওদের সেই বন্ধুত্ব আজো অটুট। সহেলী,তানিয়া, নৈঋতা,মধুরিমা,তনুশ্রী ওরা পাঁচজন, সারাক্ষণ কলেজ মাতিয়ে রাখত।আজ সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যাস্ত হলেও মাঝে মাঝেই দেখা করে সময় করে,যোগাযোগ রাখে ফোনে,ম্যাসেজ করে।আজ যখন "ফ্রেন্ডশিপ ডে" তাই তনুশ্রী ফেসবুকে ওদের একসাথে ছবি দিয়ে "মিস ইউ গার্লস" লিখেছে।পোষ্টটা দেখেই মন ভালো হয়ে গেল সহেলীর, বসের ঝাড়টাও

ভুলে গেল।ও কমেন্ট করল "মিস ইউ টু"।

হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল সহেলীর।নৈঋতার ফোন, ফোনটা ধরতেই ওপাস থেকে নৈঋতা, মধুরিমা আর তনুশ্রীর গলা শোনা গেল, "হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে!" সহেলী হাসল, "হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে!কেমন আছিস সব? "

তনুশ্রী বলে ওঠে, "আর বলিস না,কাজ করে করে পাগলা হয়ে গেলাম! "

সহেলী হঠাৎ শোনে এক খিলখিলয়ে হাসির শব্দ।

"সত্যি ভাই, লকডাউনটা হয়ে কত কাজ ঘাড়ে এসে পড়ল!একটুকু নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না!"মধুরিমা বলে।

"কোরনার বাজারে আর কি করবি বল! এভাবেই চলতে হবে", নৈঋতা বলে।

" কেউ কি সত্যি ভেবেছিলাম,যে এমন অবস্থা হবে বল!", সহেলী বলে,"যাক গে, বাদ দে! বল কেমন কাটচ্ছিস আজকে? "

"ভাই,আর কি করব! সবে অফিস থেকে ফিরলাম আমি!" তনুশ্রী বলে।

"আরে, যদি আজ দেখা করা যেত ভাল হত!কিন্তু উপায় নেই," নৈঋতা বলে ওঠে।

"হুম, ঠিক বলেছিস,কিন্তু তানিয়াটা কোথায় গেল?" মধুরিমা বলে।

"আরে ওকে ফোন করে যাচ্ছি,কিন্তু ফোন তুলছে না!ও যা ব্যাস্ততা দেখায়,যেন গোটা ব্যাঙ্কটাই ওর ঘাড়ে! " নৈঋতা বলে।

আবার খিলখিল করে মেয়েলি গলায় কেউ হেসে ওঠে এবার হাসিটা যেন থামতেই চাইছে না।

সহেলী বলে, "ও মনে হয় কাজে ব্যাস্ত আছে, ছাড়

পড়ে ফোন করে নেব সবাই একদিন।আজকাল ওর এমন দর বেড়েছে!দাঁড়া না, সব উসুল করব একদিন দেখা করে ওর থেকে সবাই, ব্যাটা ম্যানেজার হওয়ার পর খাওয়ালো না ওবদি!"

আবার খিলখিলয়ে হাসির আওয়াজ মেয়েলি গলায়, এবার যেন হাসির মাত্রাটা একটু বেশি।

সহেলী খেয়াল করে ওদের কন কলে কারোর যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। এমনকি ওদের কথায় হাসছেও খুব মেয়েলি গলায়!

এবার সহেলী একটু বিরক্ত হয়,"এই তোরা কে এত হাসছিস বলত!আর এত হাসলে দেখ,সব দাঁত ভেঙে দিয়ে আসব আমি! কথায় কথায় এত হাসিস না তোরা, পাগলের মত!"

এবার হাসির আওয়াজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।নৈঋতা,মধুরিমা ও তনুশ্রী এবার অবাক হয়, নৈঋতাই বলে, "কই, আমরা কেউ তো হাসছি না! তুই সারাদিন কল সেন্টারে কাজ করিস তো! ভুল শুনছিস।

এবার হাসির আওয়াজ তিনগুণ বেড়ে যায়। সহেলী রেগে যায় এবার," একদম ফালতু বকবি না, তোরা হাসছিস না,তো কি আমার কান বাজছে নাকি!এতটাও ভুল শুনি না আমি! "

এবার ওরা সবাই বলে ওরা মিথ্যা বলছে না,যাই হোক তখনকার মত ব্যাপারটা ওখানেই ইতি হয়। সহেলী বাড়ি ফিরে ফ্রেস হয়ে খেতে বসে।মা চিকেন কারি খুব বেড়ে রেঁধেছিল।রাতে শুতে যাবার সময় ঘটনার কথা মনে পড়ে মনটা কেমন খচ খচ করে সহেলীর।বন্ধুরা কেউ মজা করেছে ভেবে ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মাঝরাতে একটা অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে যায় সহেলীর।দেখে বিছানার পাশে যেন একটা ছায়ামূর্তি,ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।কে ও! "কে? " বলে ভালো করে তাকাতেই দেখে তানিয়া,একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে।ভয় পায় সহেলী অন্ধকার ঘরে তানিয়া এল কি করে! কিছু বোঝার আগেই ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে যায়। ভয়ে চিৎকার করে সহেলী অজ্ঞান হয়ে যায়।

সকালে জ্ঞান হয় ওর মায়ের ডাকে, মা মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন সহেলীর।সহেলী ধড়ফড় করে উঠে বসে।

"কি হয়েছিল তোর!" সহেলীর মা বলেন। কিছু বলার আগেই তনুশ্রীর ফোন, হাউহাউ করে কাঁদছে ও।

"জানিস,কাল সন্ধে ছটায় তানিয়া মারা গেছে!কোরনা পজেটিভ ছিল ও।তিনদিন আইসোলোশনে ছিল।কাল নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, বারবার নাকি আমাদের নাম করছিল বেচারী।"

পরিণতি

মৃন্ময় চ্যাটার্জী

তখন দুপুরবেলা, নিজের ঘরে বসে একা আনমনে কি যেন এক গভীর চিন্তা করছিল পল্টু.....হঠাৎ দুম করে বাইরে বেরিয়ে এসে, "মাআআআ ও মা" বলে ডাক দিল সে। যেন এক বিশাল অনুসন্ধিৎসা তার মনে জাগরিত হয়েছে। সে অতি উৎসুক কণ্ঠে মা কে জিজ্ঞাসা করলো, "মা তুমি ভুত দেখেছো?".... শালিনী দেবী অর্থাৎ পল্টুর মা, দুপুরের অসহ্য গরমের মধ্যে রান্না ঘরে রান্না করছিলেন। একে গরম তার উপর জ্বলন্ত গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এমনিতেই হাঁসফাঁস অবস্থা তার। এর উপর ছেলের উদঘট প্রশ্নবাণে বিরক্ত হয়ে বললেন, "পৃথিবীর সবথেকে বড় ভুত তো এই বাড়িতেই আছে, রোজ দেখছি তো তাকে....". মায়ের এরকম উত্তর শুনে পল্টুর বুঝতে আর বাকি রইলনা যে মা কতটা রেগে আছে। তাই নিঃশব্দে গুটি গুটি পায়ে সে পুনরায় সস্থানে গমন করলো।

পল্টু ছোট্ট পুচকে এখন। ক্লাস 3 তে পরে। পল্টুর মা শালিনী দেবী নিপাট গৃহবধূ। পল্টুর বাবা, সৈকত

চ্যাটার্জী এক বড় সরকারি আমলা। বদলির চাকরি হওয়ার কারণে সৈকত বাবু কে বহু জায়গাতেই যেতে হয়। পল্টুর তিন বছর বয়সে তিনি বদলি হয়ে এসেছিলেন মালদা জেলায়। সৈকত বাবুর কাজের চাপ বেশি হওয়ায় পল্টু বাবা কে সেভাবে না পেলেও মা তার কাছে সবকিছু। তার যত প্রশ্ন, যত জিজ্ঞাসা সব মায়ের কাছে। বকা যতই খাক না কেন প্রশ্ন শেষ হয়না ওর। শালিনী দেবীও পল্টু অন্ত প্রাণ, কিন্তু ওই যে ওর নিরন্তর প্রশ্নবাণের জবাব দিতে ক্রমাগত বিধ্বস্ত হতে হয় তাকে। তবুও দিনশেষে পল্টুই তার সব, তার নয়নের মণি। পল্টু ডাক নাম হলেও ওর একটা বেশ সুন্দর মিষ্টি পোশাকি নাম আছে..... অগ্নিশ্বর চ্যাটার্জী।

ছোট্ট পল্টুর একটাই স্বপ্ন ভুত দেখবে সে। কিভাবে দেখা যাবে, কেমন দেখতে হয় ওদের এসব নিয়ে ওর উৎসুকতার অন্ত নেই। কোনো এক সময় দিদুন এর কাছে সে ভুত এর গল্প শোনে। তখনই দিদুন কে সে জিজ্ঞাসা করে.... "আচ্ছা দিদুন ভুত কেমন হয়...ওরা দেখা দেয় সবাইকে?"। ছোট্ট পল্টুর প্রশ্নের উত্তরে হাঁসিমুখে তার দিদুন বলে, "না সোনা, ভুতেরা সবসময় সবাই কে দেখা দেয় না, ভাগ্যে থাকলে তবেই দেখা

যায় তেনাদের"। পল্টু তার শিশুসুলভ সরল মনে পুনরায় প্রশ্ন করে, "আমাকে দেখা দেবে? আমি দেখতে পাবো ওদের? আমার ভাগ্যে আছে ওদের দেখা পাওয়া?"। দিদুন একগাল হাঁসি নিয়ে বলে, "তেনাদের ইচ্ছা হলে নিশ্চই দেখা দেবে"। এর পর থেকেই ভুত নিয়ে, তাদের দেখা পাওয়া নিয়ে খুব উৎসুকতা পল্টুর।

ছোট্ট পল্টু পড়াশোনার সাথে সাথে ভুতের চিন্তা নিয়েই বড় হতে থাকে একটু একটু করে। ঠাকুমার ঝুলি, চাঁদের বুড়ি আরও বিভিন্ন কার্টুন গল্প সমগ্র টিভি দেখে জানতে থাকে সে। একদিন সে টিভিতে এক শাঁকচূন্নী আর তান্ত্রিকের গল্প দেখছিল। হঠাৎ তান্ত্রিকের একটা মন্ত্র তার খুব ভালো লেগে গেলো। সে ভাবলো এই মন্ত্র লিখে রাখলে ভালোই হবে, ভুত বা পেত্নী এলে বেশি ভয় যদি পাই তখন এই মন্ত্র বলে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। শিশু মনে কখন যে কি ইচ্ছা জাগরিত হয় সেটা কেই বা বুঝতে পারে। সে পেন খাতা নিয়ে মন্ত্র লিখতে লাগলো.....তান্ত্রিক বলে আর পল্টু লেখে। মন্ত্রটা হলো এইরকম - "লাং ডুম ডাং, কিরিমিরি করাৎ। ভুত পেত্নী শাঁকচূন্নীর ঘাড় মটকে দেব মরাৎ।"

"ফুরুং ফারাং ফস, ভুত পেত্নী দত্তি দানব সবাই আমার বশ।"
"হলুদ পোড়া সরষে, মারবো ঝাঁটা জোরসে।"

পল্টু যেন এবার আরও বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে, সে ভুত তাড়ানোর মন্ত্রও শিখে নিয়েছে আজ। মা কে সে বললো, "মা আমি ভুত তাড়ানোর মন্ত্র শিখে নিয়েছি, তোমার আর ভয় নেই"। ছেলের কথা শুনে হাঁসতে থাকে শালিনী দেবী।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত। আদরের ছোট্ট সেই পল্টু আজ অগ্নিশ্বর চ্যাটার্জী হয়ে উঠেছে। এক সুপুরুষ সুদর্শন যুবক। সে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সাইকোলজি নিয়ে স্নাতক। অনেক বন্ধুবান্ধব তার। পল্টুর অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব এবং বিনয়ী স্বভাবের কারণে সে সবার খুব প্রিয়।

কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করার সুবাদে সে এখন অনেক আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠলেও তার ছোট্ট বেলার সেই সরল মনের ভৌতিক অনুসন্ধানে কোনো ভাটা পড়েনি আজও।

তার প্রিয় বন্ধু সাগ্নিক। সে জলপাইগুড়ির এক ছোট্ট গ্রামের থেকে কলকাতায় পড়তে আসে, সেখানেই আলাপ দুজনের। সাগ্নিক কিন্তু পল্টুর ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তবুও দুজনে দুজনের প্রাণ। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে না, যে চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে....অনেকটা ঠিক সেরকম। পল্টু যতটা ভূতান্বেষী স্বভাবের, সাগ্নিক ততটাই ভুতের অস্তিত্বকে পদে পদে নস্যাৎ করে। পল্টুর খারাপ লাগে, তবুও কিছু বলেনা সে সাগ্নিককে। ভুতের ব্যাপার টা এড়িয়ে চলে সাগ্নিকের থেকে।

একবার বর্ষার সময় হঠাৎ করে সাগ্নিক পল্টুকে তার বাড়ি অর্থাৎ জলপাইগুড়ি যেতে অনুরোধ করলো। পরীক্ষাও শেষ তার উপর এরকম বর্ষায় জলপাইগুড়ির গাছপালায় ভরা প্রাকৃতিক দৃশ্য, চা বাগান এবং সর্বোপরি গরুমারা অভয়ারণ্য দেখার নির্ভেজাল আনন্দের লোভ পল্টু ছাড়তে রাজি ছিল না। তাই এককথায় রাজিও হয়ে গেল সে।

হাওড়া থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস এ চেপে বসলো ওরা দুজনে। রাত্রের খাবার খেয়ে নিয়েছিল ওরা।

কিন্তু রাস্তায় খাবে বলে কিছু স্ন্যাকস আর জলের বোতল নিয়ে নেয়। ট্রেন হাওড়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলে পল্টু বলে, "তুই এত সুন্দর প্রপোজাল দিয়ে যে কি আনন্দ দিলি না আমাকে, বলে বোঝাতে পারব না রে"। সাগ্নিক বলে, "চল তো আগে, তোর সব ইচ্ছা পূরণ করবো"। পল্টু সাগ্নিক কে বলে, "সব ইচ্ছা মানে?"। সাগ্নিক বলে, "গেলেই জানতে পারবি"। কথাটা বলার সাথে সাথেই সাগ্নিকের চোখে যেন একটা কপট হাঁসি খেলে গেল। পল্টু আর কথা না বাড়িয়ে জানলার পাশে নিচের বার্থ এ বসে থাকলো, আর সাগ্নিক উপরের বার্থ এ উঠে শুয়ে পড়লো। জানলার ধারে বসে ফুরফুরে হওয়া খেতে খেতে কখন যেন পল্টুও ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলে ওরা নেমে পড়লো। ওখান থেকে একটা টাটা সুমো ভাড়া করে ওরা দুজন সাগ্নিকের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলো। সাগ্নিকের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় সকাল ১০.৩০ বেজে গেল। বাড়িতে পৌঁছেই ওরা দুজনে ভালো ভাবে স্নান করে নিলো। সারা রাত্রি ট্রেন ভ্রমণের ধকল অনেকটা লাঘব হলো ঠান্ডা জলে স্নান করে। এর পর দুপুরের খাবার খেয়ে দুজনে টানা একটা ঘুম দিলো। যখন ঘুম

থেকে উঠলো দুজনে তখন বৈকাল ৫টা। সেদিনটা সাগ্নিক দের গ্রাম পায়ে হেঁটে সাগ্নিকের সাথেই ঘুরে দেখলো পল্টু। খুব সুন্দর সবুজে মোড়া নির্মল প্রকৃতির কোলে একখানা ছোট্ট গ্রাম। কত গাছপালা, কত মাটির বাড়ি, মাঝে মধ্যে কিছু পাকা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা এক অজানা আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলো পল্টুর। এসব তো আর কলকাতায় নেই। শুধু কংক্রিটের জঙ্গল সেখানে।

পরের দিন গরুমারা অভয়ারণ্য দেখাতে পল্টুকে নিয়ে গেল সাগ্নিক। পল্টু সেখানে চিতা বাঘ, বাইসন, ময়ূর অনেক কিছু দেখলো। অনেকটা সময় তারা ওই অভয়ারণ্যে কাটায়। তারপর সাগ্নিক পল্টুকে নিয়ে একটি চা বাগানে গেল। পল্টু দেখলো....চা বাগানের ঢালু জমি যেন উঁচু থেকে নিচু হয়ে নেমে গেছে, চা গাছ গুলো ওই ঢালু জমিতে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। "কি অপরূপ সৌন্দর্য্য" বলে ওঠে পল্টু। সাগ্নিক বললো, "এতদিন তো ছবিতে, টিভিতে চা বাগান দেখেছিস এবার সচক্ষে দেখ"। পল্টু অপলক দৃষ্টিতে প্রকৃতির সবুজ সৌন্দর্য যেন প্রাণ ভরে উপভোগ করতে থাকে। তার মনে হলো, এখানেই

থেকে যাবে সে..... আর ফিরবে না। এমন সময় সাগ্নিক বলে ওঠে, "অনেক্ষণ হলো রে, এবার চল বাড়ি ফিরতে হবে"। পল্টুর স্থির চিত্তে সাগ্নিকের কথা যেন অতর্কিতে আঘাত করলো। পল্টু বলে ওঠে, "ও হ্যাঁ চল চল"। দুজনে ফিরে আসলো সেদিনের মতো।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির দাওয়ায় বসে বসে গল্প করছিল দুজনে। এমন সময় সাগ্নিক বলে ওঠলো, "ভুত দেখতে চাস?"....হঠাৎ সাগ্নিকের মুখে এরকম কথা শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও উৎসুক কণ্ঠে পল্টু বলে উঠলো, "কে দেখাবে তুই?"। সাগ্নিক হালকা হাঁসি ঠোঁটের কোণে এনে বললো, "হুম হুম"। পল্টুর সারা শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠলো ছেলেবেলার স্বপ্ন পূরণের আশায়। তবুও সাগ্নিকের মতো ভুত অবিশ্বাসী ছেলের হঠাৎ তাকে ভুত দেখানোর কথায় কেমন একটা খটকাও লাগলো পল্টুর মনে। তবুও এতদিনের স্বপ্ন পূরণ যদি সাগ্নিকের দ্বারাই সম্ভব হয় তাতে ক্ষতি কি? হোক না ও অবিশ্বাসী, আমার ভুত দেখা নিয়ে তো কথা...ভাবতে থাকে পল্টু। "কবে দেখাবি, কিভাবেই বা দেখাবি?" প্রশ্ন করলো পল্টু। সাগ্নিক উত্তর দিলো,

"কাল অমাবস্যা, কালই দেখাবো। কিভাবে সেটা সময়ে জানতে পারবি"। পল্টু আর কোনো প্রশ্ন করলো না।

পরের দিন সকালে সাগ্নিক বাইরে যাবার আগে পল্টু কে বলে গেল, "তোর ইছাপুরণের ব্যাবস্থা করতে চললাম। তুই ততক্ষণ আমার ভাইয়ের সাথে গল্প কর।" সাগ্নিকের ভাই, নাম তার দেবদত্ত। ভালোবেসে দেবু বলে ডাকে সবাই ওকে। ও এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা ওর শখ। সুঠাম শক্তিশালী শরীরের অধিকারী সে। খুব ভালো ফুটবলও খেলে। যাইহোক সাগ্নিক ফেরার আগে ওর ভাইয়ের সাথে খুব ভালো একটা সময় কাটালো পল্টু। পল্টুর কেমন একটা মায়া পরে গেল সাগ্নিকের ভাইয়ের প্রতি, খুব ভালো ছেলেটা।
দুপুর ঠিক ১২টায় ফিরে এলো সাগ্নিক। এসেই বললো, "ব্যাবস্থা হয়ে গেছে"। সাগ্নিকের কথা শুনে পল্টু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো ভুত দেখার উৎসুকতায়।

সন্ধ্যার সময় পল্টুকে নিয়ে সাগ্নিক বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। গ্রাম থেকে অনেক দূরে একটা ভাঙা বাড়ির নিকট পৌঁছলো তারা। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা।

অমাবস্যার নিকষ অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর ক্ষীণ জ্যোতি চোখে এলো পল্টুর। আলো টা ওই বাড়ির বাইরে জ্বলন্ত কোনো বস্তু থেকেই আসছিলো। অন্ধকারের আলোয় দূর থেকে বাড়িটিকে দেখে মনে হল, যেন এক বিভীষিকা তার অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষায় অপেক্ষমান। ভূতান্বেষী পল্টুর বুকটা আজ কেমন যেন ছেঁৎ করে উঠলো প্রথমবারের জন্য। সে সাগ্নিককে বললো, "সত্যি কি ভুত আছে ওখানে, নাকি মজা করছিস?"। সাগ্নিক বললো, "কেন তুই ভয় পাচ্ছিস নাকি? তুই তো ভুত দেখতে চাইতিস, ভয় পেয়ে গেলি এর মধ্যে?"। পল্টু সাগ্নিকের এরকম শ্লেষপূর্ণ কথায় কিছুটা লজ্জিত বোধ করলো।
পল্টু বললো, "আরে ধুর ভয় কেন পাবো। তুই তো সবসময় এসব নিয়ে মজা করিস তাই বিশ্বাস হচ্ছে না"। সাগ্নিক বললো, "চল মজা সত্যি হবে আজ"।

পল্টু আর কিছু না বলে সাগ্নিকের পিছু পিছু চলতে থাকে। চলতে চলতে পল্টু লক্ষ্য করে আকাশ যেন এক ঘন মেঘে আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছে।

ভাঙা বাড়িতে পৌঁছে তারা দেখলো কয়েকজন

মাঝবয়সী লোক বসে আছে, আর তাদের সামনে খড়, কাঠ, পাতা একত্রিত করে আগুন জ্বালানো। সেই আলোই হয়তো পল্টু দেখেছিল দূর থেকে। সাগ্নিক ওদের মধ্যে একজন কে উদ্দেশ্য করে বললো, "হরেন আমরা এসেছি, তুই ব্যাবস্থা করে রেখেছিস তো?"। মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলো লোকটি। তারপর আমাদের কে নিয়ে ওই বাড়ির একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা খুলতেই ক্যাঁচ কুঁচ শব্দে ভরে উঠলো চারিদিক। যেন কোনো রকমে দরজা খানা তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল নিজের জীর্ণ বিদীর্ণ আওয়াজের মাধ্যমে। পল্টুর মনে হলো, কে যেন তাকে ফিস ফিস করে বলছে, এক চরম পরিণতি আসন্ন...চলে যা.... চলে যা....। পল্টু একটু থমকে যায়। সাগ্নিক বলে ওঠে, "দাঁড়ালি কেন? ভিতরে আয়"। পল্টু যেন যেতে চাইছিলো না, কিন্তু পাছে সাগ্নিক আবার তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে সেই ভয়ে চুপচাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো সে। ঘরের মধ্যে একটা গুমোট অন্ধকার। ঘরে ঢুকতেই কেমন একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এলো পল্টুর, গা টা কেমন যেন করে ওঠলো তার। হঠাৎ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালার আওয়াজ হলো তক্ষুনি। পল্টু ফিরে তাকিয়ে দেখলো যে, লোকটা দেশলাই এর জ্বলন্ত

কাঠিটা নিয়ে ঘরের মধ্যিখানে বসানো একটা মোমবাতির সলতে তে আগুন টা ছোঁয়াতেই ঘরের গুমোট আঁধার কেটে চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় পল্টু দেখলো, ঘরের মধ্যিখানে একটা ছোট্ট টেবিলের মতো জিনিস রাখা আছে, তার উপর বড় একটা মোমবাতি বসানো, আর তার চারি পাশে একটু দূরে দূরে চারদিকে চারটি আসন পাতা। সাগ্নিক পল্টুকে সামনের আসনে বসতে বলে এবং নিজে তার পাশের পাতা আসনে বসলো। টেবিলের কাছে ফাঁকা জায়গাটাতেও একটা আসন পাতা। এসব আয়োজন দেখে পল্টু বললো, "সাগ্নিক তুই কি প্লানচেট করতে চাইছিস?"।
"হ্যাঁ" উত্তর করলো সাগ্নিক।
পল্টু বললো, "কিন্তু কাকে ডাকবি তুই, মৃত্যু হয়েছে এমন কাউকেই তো ডাকার নিয়ম"।
সাগ্নিক বললো, "হ্যাঁ তেমন কাউকেই ডাকবো নাহয়"।

ততক্ষনে বাইরে থেকে আরো দুজন ঘরের ভিতর ঢুকেছে। একজন মাঝবয়সী লোক আর একজন একটু অল্প বয়সী ছেলে। ঢুকেই তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘরের ভিতর আগেই প্রবেশ করে থাকা হরেন

ও ততক্ষনে একটা আসনে বসে পড়েছে। বাকি থাকা আসন টায় ওই মাঝবয়সী লোকটি বসে এবং অল্পবয়সী ছেলেটি টেবিলের সন্নিকটে থাকা আসন টায় বসে পড়লো। ওই ছেলেটাই মিডিয়াম এর কাজ করবে, ভাবে পল্টু। হরেন বললো, "যদি তোমাদের পরিচিত কোনো ব্যক্তি মারা গিয়ে থাকেন তার নাম বলো, যাকে তোমরা দুজনেই চেনো"।
পল্টু আস্তে করে সাগ্নিককে জিজ্ঞাসা করলো, "কার নাম বলবো রে?"।
সাগ্নিক বললো, "ষষ্ঠীচরণ বাবু, আমাদের প্রফেসর। যিনি আগের বছর মারা গেলেন"। পল্টু সম্মতি জানায়। তখন হরেন বলে, "তোমরা মনে মনে ওনাকে, ওনার ছবিটা স্মরণ করতে থাকো"। তারপর ওরা সবাই চোখ বন্ধ করে নিল এবং একে অপরের হাতে হাত রাখলো। পল্টু আর সাগ্নিক ও চোখ বন্ধ করে এক মনে ষষ্ঠীচরণ বাবুর মুখটা কল্পনা করতে থাকলো।

হঠাৎ মিনিট পাঁচেক পর, টেবিলের কাছে বসে থাকা ছেলেটি কেমন যেন গোঙাতে শুরু করলো। ততক্ষনে বাইরেও মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গোঙানির শব্দে চোখ খোলে পল্টু। সে ভুত বিশ্বাসী, ভুত দেখার

অমোঘ আকর্ষণ ও আছে তার। কিন্তু প্লানচেট বিষয় টা তার ঠিক অজানা না হলেও সে স্বশরীরে কখনোই প্লানচেট বিষয় টার সাক্ষী থাকেনি। তাই সে ভেবে নিলো, হয়তো ষষ্ঠীচরণ বাবুর আত্মা ওই ছেলেটির উপর ভর করেছে। পল্টু আস্তে করে সাগ্নিককে ডাকলো। সাগ্নিক চোখ খুলে ছেলেটার গোঙানি দেখে পল্টু কে বললো, "মনে হয় প্লানচেট successful"

সেই সময়েই হরেন মোমবাতির শিখার অপর প্রান্ত থেকে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠলো, "কে তুই?".....ছেলেটি গোঙানি ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো, "আমি ষষ্ঠীচরণ। আমাকে তোরা কেন ডাকলিইইই...."।
তখন হরেন সাগ্নিককে উদেশ্য করে বললো, "তোমাদের কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে পারো ওনাকে"। তখন সাগ্নিক ওই আত্মা ধারী ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলো, "স্যার আপনি কোন কলেজে পড়াতেন? কিভাবে মারা গেলেন?"।
উত্তর এলো, "আমি সেন্ট জেভিয়ার্স এ পড়াতাম। হঠাৎ করে হার্ট এ্যাটাক করে মারা যাই আমি"।
সাগ্নিক আবার বললো, "স্যার আপনার প্রিয় কোনো

ছাত্র ছিল যাকে খুব ভালোবাসতেন?"।
উত্তর এলো, "হুম....অগ্নি"। পল্টু যতটা রোমাঞ্চিত ছিল তার থেকেও বেশি আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়লো তার প্রিয় স্যার এর থেকে তার নাম শুনে। পল্টু ভাবতে লাগলো, মৃত্যুর পরও তাহলে কেউ ভোলেনা ইহজগতের কথা। সাগ্নিক পল্টুর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললো, "দেখ এবার বিশ্বাস হলো তো এটা স্যার"। পল্টু মাথাটা হালকা নাড়িয়ে সম্মতি প্রদান করেই ছেলেটাকে প্রশ্ন করে উঠলো, "স্যার আমার জন্মদিনে আমাকে আপনি শেষ কি উপহার দিয়েছিলেন বলুন তো?"।
আত্মাধারী ছেলেটি এরকম অকস্মাৎ অজানা প্রশ্নে গোঙানি বাদ দিয়ে চোখ খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাগ্নিকের দিকে তাকালো। পল্টু প্রশ্ন করতেই ছেলেটির ভৌতিক চরিত্রের নিমেষে এতটা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণ অনুধাবন করতে না পেরে সাগ্নিকের দিকে সেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। সাগ্নিক ও এহেন পরিস্থিতির কল্পনা করেনি সম্ভবত। সাগ্নিক বুজতে পারলো, তার আরো একটু দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল। সত্যি তো, পল্টুর ও তো প্রশ্ন থাকতে পারে, এটা সে একেবারেই ভুলে গেছিল। সাগ্নিকের

অভিব্যক্তি দেখে পল্টুর বুঝতে বাকি থাকলো না যে, পুরো ঘটনাটাই সাগ্নিকের সাজানো।

পল্টুর শৈশবের ইচ্ছার এত বড় অপমান সে সহ্য করতে না পেরে উঠে গেল আসন থেকে, আর তীক্ষ্ণ গলায় সাগ্নিককে বললো, "মজা করছিলি আমার আবেগ নিয়ে?" বন্ধুত্বের এত বড় দাম দিলি তুই?....ছিঃ সাগ্নিক ছিঃ...."।

অতর্কিতে পল্টুর দিক থেকে ধেয়ে আসা তীক্ষ্ণ ঘৃণা ভরা বাক্যবাণে বিচলিত হয়ে আসন থেকে উঠে পরেই তার হাত দুটো চেপে ধরলো সাগ্নিক। বন্ধুত্বের অপমান সে করতে চাইনি, শুধু পল্টু ভুত দেখতে চায় বলে একটু ভয় দেখিয়ে ভুতের পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু সেটা যে এভাবে পরিণতি পাবে ভাবতেই পারেনি সাগ্নিক, তাহলে হয়তো এসব কিছুই করতো না সে। সাগ্নিক পল্টু কে বুঝিয়ে বলতে গেল সবটা, কিন্তু পল্টু আর এসব সহ্য করতে পারছিল না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। সাগ্নিক তার এহেন কাজের পরিণতিতে তীব্র লজ্জাবোধ নিয়ে পল্টু কে গিয়ে

বললো, "বন্ধু আমি একটা ভুল করে ফেলেছি, আর একটা সুযোগ দিবি সত্যি সত্যিই কিছু করার?"।

সাগ্নিক খুব ভালো বন্ধু পল্টুর, তাই পল্টুও নিজের তাৎক্ষণিক উগ্র ব্যাবহারে ভীষণভাবে কষ্ট পেয়েছিল। ওভাবে সাগ্নিককে কথা গুলো বলা ঠিক হয়নি তার। সেটা অনুমান করেই পল্টু বললো, "বেশ এটাই শেষ সুযোগ কিন্তু"। সাগ্নিক এই সুযোগ টা পেয়ে যেন খুব খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু এই শেষ সুযোগ যে কত বড় পরিণতির প্রমাদ গুনছিলো সেটা সম্পর্কে হয়তো ওরা দুজনেই অবগত ছিল না।

ওরা দুজন আবার ঘরের ভিতরে এলো। ততক্ষনে বৃষ্টি অনেকটাই ধরে এসেছে, আর বৃষ্টির পর একটা মৃদু ঠান্ডা হওয়া বইতে লেগেছে বাইরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো সাগ্নিক। জানলা দুটি প্রথম থেকেই বন্ধ ছিল। সাগ্নিক হরেন কে উদ্দেশ্য করে বললো, "আমার সম্মানের প্রশ্ন হরেন, এবার যা হবে সত্যি সত্যিই হবে"। হরেন চমকে গিয়ে বললো, "সত্যি সত্যি মানে?"। "মানে আবার কি, সত্যি আত্মা কে ডাকবো আমরা" বলে উঠলো সাগ্নিক।

যেন সম্মান রক্ষার তাগিদে সে পাগল হয়ে গেছে। হরেন বা বাকি সদস্যরা কেও কিছু বলার সাহস পেলোনা। তারা যে রীতিমত পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে সাগ্নিকের থেকে এই সব কিছু সাজানোর জন্যে।

পল্টু বলে উঠলো, "সাগ্নিক কোনো ক্ষতি হবেনা তো?"।
"না বন্ধু কিচ্ছু হবে না" আস্বস্ত কণ্ঠে বললো সাগ্নিক।

ওরা কেউই কোনোদিন প্লানচেট করেনি। সবটাই করছিল নিছক মজার চলে। কিন্তু হঠাৎ সত্যি করে করতে হবে জেনে ওরাও একটু হতভম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু অগত্যা না তো করতে পারবে না, তাই রাজি হতেই হলো।

সবাই আবার আগের মতো করে বসে পড়লো মোমবাতির সামনে। ওই ছেলেটিও সস্থানে বসে পড়লো আবার।
"কাকে ডাকবে বাবু?" বিস্ময়ের সুরে হরেন প্রশ্ন করলো সাগ্নিককে।

"দেবদত্ত", বলে উঠলো সাগ্নিক। চমকে উঠলো পল্টু।

"কি.... দেবু....?" পল্টু বিস্ময় ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে উঠলো।
"হ্যাঁ... দেবু" গম্ভীর গলায় উত্তর এলো সাগ্নিকের থেকে। সাগ্নিকের দৃঢ় গলার উত্তর শুনে নির্বাক হয়ে গেল পল্টু। সে যে বারণ করবে সে ক্ষমতা টুকুও যেন আর নেই তার।

তবুও পল্টু বললো, "দেবু তোর ভাই সাগ্নিক, ও তো জীবিত। তুই শুধু নিজেকে ঠিক প্রমান করবি বলে এতবড় ভুল কিভাবে করতে পারিস? আর তাছাড়া জীবিত কোনো মানুষকে প্লানচেটে আহবান করা যায় না। আমার আর এসব ভুত টুত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই।"

সাগ্নিক বলে উঠলো, "আমার দেওয়া কথা আমি রাখবো ব্যাস। কিভাবে রাখবো সেটা আমাকে বুঝতে দে। তুইও দেবু কে চিনিস আমিও চিনি, নিশ্চই অসুবিধা হবে না তোর ওকে মনে করতে।" চুপ করে গেল পল্টু, বুঝতে পারলো তার রাগের মাথায় বলা কথাগুলো খুব সিরিয়াস ভাবে নিয়ে নিয়েছে সাগ্নিক। একরোখা ছেলে ও, বললেও আর শুনবে না।

সবাই চোখ বন্ধ করলো। কিন্তু পল্টু যেন এটা মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। দেবু.....সে তো জীবিত তাহলে সাগ্নিক হঠাৎ তার নাম করলো কেন।
পল্টু সাগ্নিককে শেষ বারের মতো আস্তে করে ডেকে বিষন্ন কণ্ঠে বললো, "দেবু কেনো রে? অন্য কাউকে তো ডাকতে পারি আমরা।"
সাগ্নিক বললো, "অন্য কাউকে তারা দুজন একসাথে চেনে না, কিন্তু দেবু কে পল্টুও চেনে"।

সাগ্নিক যেন পাগল হয়ে গেছে, পল্টু অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে নিলো। ডাকতে লাগলো তারা এক মনে.....

দেবু.....দেবু.....অনেক্ষন যেন এক স্থির নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বাইরের হওয়া যেন তার মিষ্টি মৃদুমন্দতা পরিত্যাগ করে বিকট শোঁ শোঁ শব্দে বইতে শুরু করেছে। হাওয়ার বেগে জানালা, দরজা সব দুম দাম আওয়াজ করে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পল্টুর চোখ খুলে গেল, এসব কি হচ্ছে ভেবে চমকে উঠলো পল্টু। হঠাৎ মোমবাতির শিখা দমকা হাওয়ায় দপ করে নিভে যেতেই যেন এক সর্বগ্রাসী ঘন অন্ধকারে ভরে

গেল চারিদিক। আর তখনই গুমোট অন্ধকারের ভিতর থেকে এক বিকট আওয়াজে কে যেন বলে উঠলো, "হুঁউউউ হুঁউউউউ..... আমাকে কেন ডাকলি....কেন ডাকলি তোরা??? তোদের কি ক্ষতি করেছিলাম আমি.....হুঁউউউ..."।

মোমবাতির কাছে বসে থাকা ছেলেটির মধ্যে যেন কোনো এক পৈশাচিক শক্তি ভর করেছে। তাকে হরেনরা দুজন মিলে ধরেও যেন সামলে রাখতে পারছে না কিছুতেই। এত ক্ষমতা ওই ছোট ছেলেটার কিভাবে হতে পারে ভেবে তারা যেন হকচকিয়ে গিয়েছে।

সাগ্নিক এসব দৃশ্য চাক্ষুস করে এবার যেন খুব ভয় পেয়ে গেলো। সে ভেবেছিল আবার কিছু একটা মজা করবে। কিন্তু এরকম কিছু হতে পারে কল্পনাও করেনি সে। সেই পৈশাচিক শক্তি যেন এক তীক্ষ্ণ যন্ত্রনা আর হিংসা ভরা দৃষ্টিতে সাগ্নিকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "মেরে দিলি আমায় তুই.... মেরে দিলি...."।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গেল ছেলেটি। তখনই এক দমকা হাওয়া কোথা থেকে এসে ঘরের চারিদিকে যেন এক বরফ শীতল নিস্তব্ধতা তৈরি করলো। সাগ্নিক

চুপ করে বসে আছে, সে যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেছে। হরেন সঙ্গে সঙ্গে জল ছেটা দিলো ছেলেটির মুখে চোখে। একটু পর জ্ঞান ফেরে ওর। ছেলেটির শরীরে উঠে দাঁড়ানোর তখন আর ক্ষমতা নেই। হরেন বললো, "বাবু আপনারা বাড়ি যান, যা হলো ঠিক হলো না বাবু"।

পল্টুর মন ও এতে সায় দেয়নি প্রথম থেকেই। যাইহোক সে সাগ্নিককে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে রওনা দিলো। বাড়ি পৌঁছেই পল্টু প্রথমে দেবুর শোবার ঘরে যায়, গিয়ে দেখে দেবু ঘুমিয়ে আছে। কাছে যেতেই চমকে ওঠে পল্টু, দেখে... তার চোখ দুটো বিস্ফারিত, নিঃশ্বাস বন্ধ হলে যেমন হয় ঠিক তেমন। শরীর টাও যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে । দেবু আর নেই, বুঝতে বাকি থাকলোনা পল্টুর। সাগ্নিক ও ভাইয়ের এই অবস্থা দেখে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। পল্টু সাগ্নিকের কাছে দৌড়ে যায়, কিন্তু এ কি?.....সাগ্নিকের গায়ে হাত দিতেই ওর শরীর টা অসাড় ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

"সাগ্নিককককক....." বলে চিৎকার করে ওঠে পল্টু। সাগ্নিক আর নেই। পল্টুর চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

ততক্ষনে পল্টুর চিৎকার শুনে সাগ্নিকের বাড়ির সবাই ছুটে আসে.....তারাও এরকম অতর্কিত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

তারপর সাগ্নিক আর দেবুর সমস্ত ক্রিয়া কর্ম শেষ হলে পল্টু তাদের পরিবারের থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা ফিরে আসে।

পল্টু ফিরে এসে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। সেদিন রাত্রে একা একা ফ্লাট এর বেলকনিতে বসে রাত্রের নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভাবতে থাকে, ভুত অণ্বেষনের ইচ্ছা নিশ্চই ছিল তার....কিন্তু সেটা পূরণ করার এক অনিবার্য জেদ যে এত বড় এক মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনবে তার প্রিয় বন্ধু আর তার ভাইয়ের জীবনে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

ভিত রহস্য

অমিত কুমার সাহা

পড়াশোনা শেষ করার অনেকবছর পর রনি একটা চাকরি পেলো, সরকারি চাকরি। সারা পরিবারে খুশীর হাওয়া।পরিবার বলতে তিনজন,মা বাবা আর রনি নিজে। এতদিনের কষ্টের যেন সার্থকতা। প্রতিদিন সকালে উঠে রনি চাকরিতে যায়, সন্ধ্যে হয়ে যায় ফিরতে ফিরতে। ওদের একটা বাড়ি আছে, কাঁচা বাড়ি। বৃষ্টি হলে চাল দিয়ে জল পড়ে, ঘরের ভেতর ভিজে যায়।এ ছবি বহুদিনের পুরনো।দু'বেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করে, রনির পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়েই গোটা সংসারের হিমশিম অবস্থা!ঘর ঠিক করার দরকার হলেও তার আর সামর্থ্যে কুলায় নি। ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ি,তা নিয়ে কম কথা শুনতে হয়না ওদের। এমনকি ওদের আত্মীয় স্বজনরাও তেমন আসে না ওদের বাড়িতে!

তাই রনির ইচ্ছে ছিল বরাবর এই পরিচিত ছবিটা বদলানোর। রনি নতুন চাকরি পেয়ে পায়ের তলায় যেন একটু মাটি পেলো! মনে মনে ভাবে কিভাবে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করা যায়?

একদিন কাজের জায়গায় আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ করে কথাপ্রসঙ্গে রনি ওর এক কলিগকে ওর পাকা বাড়ি তৈরির স্বপ্নের কথা বললো।ঐ কলিগ রনিকে একটা বুদ্ধি দেয়।

রনিদের বাড়ির জায়গাটা বেশ কম। তাই রনি লোন নিয়ে একটা নতুন জায়গা কেনে ঐ কলিগের বুদ্ধি মতো। তবে জায়গাটা মূল শহর থেকে অনেকটাই দূরে।আর সেজন্য দামটাও অনেকটা কমেই পেয়ে গেলো! এরপর হোম লোন নিয়ে আগের লোনের টাকাটা শোধ করে দেয়। বাড়ি তৈরির স্বপ্ন সফল হবার দোরগোড়ায় রনিরা।

ঠিক হয় ভিত করেই বাড়ি করবে।ভিতপুজো হবার পর যথারীতি ভিতের মাটি কাটা শুরু হয়। তিন দিন মাটি কাটার পর,ভিতের মাটি কাটার সময় মাটির নীচে কিছু একটা শক্ত জিনিস কোদালে ঠেকে! ভালো করে সন্তর্পণে মাটিটা কাটার পর একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে আসে!

রনি অফিসে। রনির মা ওদের পুরোনো বাড়িতে। একজন লোক ভিতের মাটি কাটছে, রনির বাবা দাঁড়িয়ে দেখছেন।এমন সময় কোদালের মাটির তালের সঙ্গে কি একটা শক্ত সাদা জিনিস উঠে এলো। ঐ

লোকটা রনির বাবাকে বললো,
"দেখুন তো কাকা, সাদা মতো মাটিমাখা এই জিনিসটা কি?"
রনির বাবা ঐ মাটির তাল থেকে জিনিসটা বের করে জল দিয়ে ধুলেন। তারপর তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ!
"এ যে,এ যে মানুষের হাতের হাড়!"
কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না রনির বাবা।ঐ লোকটা তখন বলে,
"কাকা,এটার কথা কাউকে বলতে হবে না, লোকজন জানাজানি হয়ে গেলে নানান ঝামেলা!"
"তাহলে এটা নিয়ে এখন কি করি বলো তো?", রনির বাবা জিগ্গেস করেন।
তারপর ঐ লোকটার কথামতো রনির বাবা ঐ জিনিসটা কোনো একটা আলাদা জায়গায় রেখে
দেন।এই ঘটনার কথা আর কেউ জানতে পারে না।
পরের দিন রনির বাবা ঐ জিনিসটা নিয়ে একটা লোকের কাছে যায়।
এরপর কয়েকদিন কেটে যায়। বাড়ির ভিত কাটা কমপ্লিট। গাঁথুনি শুরু হয়েছে। বেশ কিছুটা গাঁথুনিও হয়ে গেছে। হঠাৎ রনির বাবা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেদিন রবিবার, রনি তাই বাড়িতেই। ডাক্তারের

কাছে নিয়ে যায় রনি ওর বাবাকে। ওষুধ দেন ডাক্তারবাবু।বলেন,
"ভয়ের কিছু নেই।"
রনি ওর বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কদিন ধরেই নতুন বাড়ির কাজ বন্ধ! রনির বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু চেহারায় ভাঙ্গন ধরে। দিন দিন শীর্ণকায় হতে থাকে ওনার শরীর! একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রনি বাবাকে অনেক ডেকেও কোনো সাড়া পায় না।ওর বাবার সারা শরীর ঠাণ্ডা! হৃদস্পন্দনও পাওয়া যাচ্ছে না!আর এক মুহুর্ত দেরী না করে রনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে। ডাক্তারবাবু আসেন, জানান,
"সব কালরাতে ঘুমের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে রনি!"
রনির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে!কি করবে, কিভাবে মা'কে সামলাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।
যাই হোক, বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বাড়ি ফিরে আসে রনি।কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না রনি! দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে চলে। নতুন বাড়ির স্বপ্ন বন্ধ।বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
আজ একমাস হয়ে গেল, বাবা চলে গেছেন। রনির

সবসময় বাবার কথা মনে পড়ে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের সামনে ভাসে সব!একসময় চোখ লেগে আসে।

রাতে রনির বাবা স্বপ্নে আসেন। রনিকে সেদিনের গোটা ঘটনাটি বলেন। এমনকি উনি কোথায় গিয়েছিলেন,তাও জানান রনিকে।

রনি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মা'কে আর কিছু বলে নি। অফিস যাবার সময়ে বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি থেকে।

ঠিক রনির বাবা যেমন বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী রনি সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়। জায়গাটার এক অদ্ভুত পরিবেশ, দিনেরবেলায়; তাও গা ছমছমে!এক তান্ত্রিক বসে আছেন এক বিশাল বটগাছের নিচে। রনি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়।

"কি ব্যাপার? বল বাবা!", উনি জিগ্গেস করলেন রনিকে।

রনি তখন ওর বাবার চেহারা এবং ঘটনাটির কিছু বর্ণনা দিতে ঐ তান্ত্রিক বুঝতে পারেন। রনিকে কাছে ডেকে নিয়ে বসান। উনি বলেন,

"দেখ বাবা! তোর বাবা যে জিনিসটি নিয়ে

এসেছিলেন,সেটি কোনো এক মৃত মানুষের হাতের হাড়। তোরা যে জায়গায় বাড়ি করছিস,সেটা মোটেই ভালো জায়গা নয়।ওর পাশে যে শুকনো জলা জায়গাটা আছে ওটা আগে একটা খাল ছিল।"
রনি জানতে চায়,
"জায়গাটা ভালো নয় কেন?"
উনি বলেন,
"ঐ খালটা আর তোদের কেনা জায়গাটার আশেপাশে ছিল কবরখানা।ঐ হাড়টা কোনোভাবে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া কোনো অপঘাতে মৃত্যু হওয়া শরীরের। তোর বাবা যখন ঐ হাড়টা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তখনই আমি গোটা ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। শুধু তাই নয়, উনি যে বেশিদিন আর বাঁচবেন না,তাও আমি জানতাম, কিন্তু ওনাকে কিছু বলিনি।"
রনি সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওনাকে বলে,
"এখন তাহলে আমি ঠিক কি করবো?ব্যাঙ্কের এতগুলো টাকা লোন, এদিকে বাড়িও প্রায় অনেকটাই তৈরি হয়ে গেছে, এখন তো আর আমার পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়!"
ঐ তান্ত্রিক রনিকে আশ্বস্ত করে বলেন,

"তোর বাবা নিজের হাতে ঐ হাড় স্পর্শ করেছিলেন,তাই আমিও পারিনি ওনাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে। তুই চিন্তা করিস না। আগামী শনিবার অমাবস্যা; ঐদিন আমি ছদ্মবেশে তোর ঐ জায়গায় গিয়ে কিছু ক্রিয়াকলাপ করে দিয়ে আসবো। কিন্তু ঐ জায়গায় তুই ছাড়া আর কেউ যেনো না থাকে।"
রনি সম্মত হয়।
শুক্রবার দিন কিছু মিস্ত্রি আসে,কবে থেকে বাড়ির কাজ শুরু হবে জানতে। রনি জানায়, কয়েকদিন পর রনি ওদের ফোন করে জানাবে।
শনিবার দিন,রনি ঠিক বেলা বারোটায় ওর কেনা জায়গাটায় পৌঁছে যায়। তারপরই ঐ তান্ত্রিক আসেন, কাঁধে ঝোলা,পুরোপুরি ভিখারির ছদ্মবেশ।
উনি এসে কিছু মন্ত্রপূত জিনিস রনিদের নির্মিয়মান বাড়ির চারপাশে ছিটিয়ে দেন। বাড়িটার মাঝে বসে কিছু ক্রিয়াকলাপও করেন। এমন সময় রনি দেখতে পায়, রনিদের নির্মিয়মান বাড়ির পেছনে থাকা তেঁতুল গাছটার বড় একটা কাঁচা ডাল আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।রনি খুব ভালো করে দেখে, না আশেপাশে কেউ রয়েছে, না গাছের ওপরে। এদিকে ঐ তান্ত্রিকের মন্ত্রোচ্চারণ চলছে।

একসময় ডালটি পুরোটাই মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে!
তান্ত্রিক চিৎকার করে বলে ওঠেন,
"যা! এবার মুক্তি।"

অচেনা বন্ধুত্ব

রিংকি হালদার

ঘরের মধ্যে মাত্র তিনটে মোমবাতির মৃদু আলো। দুজন মহিলা দুর্বোধ্য ভাষায় একটা বই পড়ে চলেছে। বইটার অক্ষরগুলো যেন জীবন্ত হয়ে আলোর মত জ্বলছে। সেই অপার্থিব আলোয় দেখা যাচ্ছে একজন শুয়ে আছে পাশে। কোনো স্পন্দন নেই তার শরীরে।

দেখলি ওকে? আমাদের দুজনের জন্য পারফেক্ট। বোতল থেকে পানীয় দুজনের জন্য গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলে হিয়া।

হিয়া আর তনু বেড়াতে এসেছে সমুদ্র তটের কাছে একটা হোটেলে। কটক থেকে যে হাইওয়ে সোজা কলকাতার দিকে যায়, সেটা থেকে ডানদিকে বেঁকে গিয়ে অখ্যাত অনামী এই ছোট্ট শহর। এরকম offbeat destination এর সুবিধা এটাই যে লোকজন বিশেষ আসে না এদিকে। শিকার ধরার উপযুক্ত জায়গা। এদিকেই একটা টোল প্লাজা তে আলাপ হয়েছে গোলাপের সাথে। টোল থেকে pass করা গাড়িগুলো থেকে টাকা তুলছিল গোলাপ।একজন বৃহন্নলা হলেও ভারী সুন্দর দেখতে ওকে। হতভাগ্য গুলোর উপার্জনের

সুযোগ বিশেষ নেই। কেউ বাজারে ঘোরে,তো কেউ বড়ো রাস্তার crossing গুলোতে।উগ্র সাজ সেজে রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক চালক দের শরীরের খিদে মেটায়। কষ্টের জীবন থেকে যদি কিছু জনকে মুক্তি দেওয়া হয়, ক্ষতি কি? হাসতে হাসতে এসবই আলোচনা করছিল দুজন।

তুই ওর ফোন নম্বর নিয়েছিস তো? কিছু সন্দেহ করে নি? হালকা চিন্তার ভাজ তনুর কপালে।

তনু আর হিয়া প্রাণের বন্ধু। ওদের সম্পর্ক টা বন্ধুত্বের থেকে অনেকটা বেশী। সমাজের স্বীকৃতি তো দুর অস্ত, পরিবার দুটোই মেনে নেয় নি ওদের। বরং অনেক চেষ্টা করেছিল দুজনকে আলাদা করে দেবার। কিন্তু ওরা একসাথে থাকতে চায়। সবসময়। তাই এই সিদ্ধান্ত ওদের। বাড়িতে কারোর সাথে যোগাযোগ নেই আর। সে অনেকদিনের কথা।

তনু, এই গোলাপকে চাই। হিয়া বলে।

হবে ডার্লিং হবে। তনুর গলায় আত্মপ্রত্যয়ী সুর। তারপর একে অপরের শরীরে সুখের খোঁজে মেতে ওঠে দুজন।

ইন্সপেক্টর রজত রায় খবরটা শুনে চমকে ওঠে। আবার একজন বৃহন্নলা নিখোঁজ। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন

জায়গা থেকে এই ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে ওদের নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়নি কেউই। রজত নিজেও হয়তো এতটা ব্যস্ত হত না।কিন্তু কিছুদিন আগেই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে ওর পরিচিত একজনের সাথে। তাই ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে।

রজত ফোন করে টুম্পা কে।

হ্যালো, টুম্পা। তোমার সাথে একটু দরকার ছিল।

মোবাইল ফোনের ওপার থেকে টুম্পার গলা শোনা যায়,

ইন্সপেক্টর বাবু? বলুন। কি হয়েছে? গোলাপের কোনো খবর পাওয়া গেল? কিছুটা হতাশা আর কিছুটা উৎসাহ স্পষ্ট তার কণ্ঠে।

না টুম্পা, গোলাপের খবর পাইনি। তোমাদের গোষ্ঠীর আরো একজন নিখোঁজ হয়েছে। সেই ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাই। উত্তর দেয় রজত।

টুম্পা গোলাপের সবথেকে ভালো বন্ধু। বয়সে গোলাপের থেকে বেশ কিছুটা বড়ো। একই টোল প্লাজায় ডিউটি করে ওরা।

জানেন ইন্সপেক্টর বাবু, গোলাপ এখানে আসার পর থেকে আমি সব সময় ওকে আগলে রেখেছি। কিছুদিন আগে ও বলেছিল দুটো মেয়ের সাথে ওর বন্ধুত্ব

হয়েছে। তাদের সাথে কোথায় যেনো বেড়াতে যেতে চায়। পুরুষ মানুষ কেউ যদি হত, আমি অবাক হতাম না। কিন্তু দুটো মেয়ে ওকে নিয়ে বেড়াতে যাবে শুনে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কেন যে ওকে আটকালাম না..... দুঃখ আর উৎকণ্ঠা ভরে টুম্পা বলে।

গোলাপ কে খোঁজার অনেক চেষ্টা করেছে রজত। কিন্তু সে যেনো কোথাও উধাও হয়ে গেছে। গোলাপের ফোনের call list থেকে হিয়া আর তনুর নম্বর বের করেছে network provider এর সাহায্যে। কিন্তু ফোন দুটো বন্ধ। তাই current location track করতে পারে নি। বলা বাহুল্য, গোলাপের ফোন ও switch off। Toll plaza তে শেষবার active ছিল ফোন দুটো। আর ঘণ্টা খানেক পর থেকে গোলাপের টাও। CCTV footage থেকে গাড়ীর নম্বর টা পাওয়া গেছিল বটে। কিন্তু নম্বরটা ভুয়ো। মুখ গুলো পরিষ্কার নয়। শেষ পর্যন্ত গোলাপকে খুঁজে পায়নি রজত। এবার সে আর কোনো ভুল করতে চায় না। একটা সুযোগও হাতছাড়া করতে চায় না।

শহরের বাইরের দিকে নতুন একটা বহুতল। এই জায়গাটা পৌরসভা আর পঞ্চায়েতের মাঝখানে। তাই চারপাশটা বিশেষ উন্নত নয়। আর হবার সম্ভাবনাও

কম। চারিদিকে ছড়িয়ে ইতস্তত জঙ্গল। বড়ো বড়ো জুন ঘাস। যেনো পৃথিবীর সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে একটা আলাদা দ্বীপে ঘাপটি মেরে আছে বহুতল টা। কেমন যেন একটা মনখারাপের চাদর বিছিয়ে আছে সেখানে। Main gate এর সামনে এসে হর্ণ দিতে থাকে হিয়া। বলে, এই হল মুশকিল watchman গুলোকে নিয়ে, কোথায় যে থাকে।

ওদের ডাকাডাকি তে তড়িঘড়ি ছুটে আসে watchman। দরজা খুলতে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, গাড়িতে হিয়া আর তনু ছাড়াও অন্য কেউ আছে।

পিছনের সিটে মাথা টা এলিয়ে শুয়ে আছে সে। ওরা দুজন গাড়ী টাকে পার্কিং এ রেখে নামলো। তারপর সাবধানে তৃতীয় মহিলা টিকে নামাল। বেশভূষা মহিলার বটে, কিন্তু চেহারা কেমন যেনো পুরুষালি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। আকাশের রং লাল আর বেগুনি মাখামাখি। বাসায় ফিরছে পাখির দল।তাদের ডাকে যেন অন্য কেমন সুর।

ম্যাডাম ,

হিয়া আর তনুর দিকে তাকিয়ে বলে watchman ছেলেটা, আপনাদের কি শরীর খারাপ?

তনু উত্তর দিল,

না তো, কেনো বলোতো?

আসলে আপনাদের দেখে কেমন যেন লাগছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাদের দুজনকেই। দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনাদের বয়স বেড়ে গেছে বেশ কয়েক বছর। বলে উত্তরের অপেক্ষায় হা করে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে।

ছেলেটির উত্তর শুনে চমকে ওঠে তনু আর হিয়া।

আরে হা করে তাকিয়ে না থেকে দরজা টা খোলো না। তনুর কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠে লিফটের দরজা খুলে দিল ছেলেটি।

এত রেগে যাওয়ার মত কি বললাম রে বাবা।ওদের সঙ্গে ওটা কে? অজ্ঞান ই বা হয়ে আছে কেনো? মনে মনে বিড়বিড় করতে থাকে ছেলেটি। ও নিশ্চিত, দুজনের চোখের তলায় কালি ও স্পষ্ট দেখেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বলেও মনে হল যেন।

হিয়া রে, এখানে আর নয়। লিফটে উঠে যেতে যেতে বলে তনু। এই শেষ। এবার অন্য কোথাও। আবার বলে সে। তনুও মাথা নেড়ে সায় দেয়। তারপর বলে, আজকের কাজ টা আগে করি ঠিক করে। এই কাজটা ঠিক করে হয়ে গেলে বেশ কিছুদিন ছুটি পাওয়া যাবে। ধীরে সুস্থে ভেবে কিছু একটা উপায় বার করবো।

আজ সত্যিই একটু কষ্ট হচ্ছে। পুরুষালি মহিলাটিকে ধরে নিয়ে যেতে হাঁপিয়ে উঠছে দুজন। আর অল্প সময়ের অপেক্ষা। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটা লিড পেয়েছে রজত। একটা হোটেল থেকে তিনজন মহিলা চেক আউট করেছে কিছুক্ষন আগেই। তাদের মধ্যে একজন কে চিনতে পেরেছে হোটেলের ম্যানেজার। রজতের ফোর্স তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে নিখোঁজ মানুষটিকে। খুঁজতে খুঁজতে ওই হোটেলে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় এই সাফল্য।

হ্যালো টুম্পা, একটা লিড পাওয়া গেছে। রেডি থাকো, আমি তোমায় pick up করছি আধ ঘন্টার মধ্যে।রজত ফোন করে বলল।

আধ ঘন্টা লাগলো না। তার আগেই রজত এসে পৌঁছে গেলো। টুম্পা কে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলতে শুরু করল গাড়িটা।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা ছবি দেখাল টুম্পা কে। বলল

দেখো তো, এই দুজনই সেই দুজন নাকি,?

টুম্পা ভালো করে দেখলো। মুখের মিল আছে, কিন্তু তাদের থেকে আরো বয়স্ক এরা। মাত্র ছয় মাসে করো চেহারা এমন বদলে যায় নাকি? বলল,

না না। এরা নয়। তবে এদের মতো দেখতে ছিল খানিকটা।

দ্রুত চলেছে গাড়িটা। রজত আর টুম্পার সাথে আরো জনা কয়েক পুলিশ চলেছে সাথে।

Two bedroom ফ্ল্যাটের এই ঘরটা একটু বিশেষ ভাবে সাজানো। ঘরের সব আলো নেভানো। সারা পৃথিবীর অমঙ্গল যেন জড়ো হয়েছে ওই ঘরে।মাঝখানে অদ্ভুত কিছু আকৃতির নকশা। তার একটা দিকে সুসজ্জিত একটা জলচৌকির উপর একটা বই। চামড়ার মলাটে বাঁধানো। উপরে লাল কালিতে একটা ছবি আঁকা। একটা ত্রিভুজ। তার মাঝে একটা চোখ। সেই চোখের দিকে তাকালে বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। যেন কি নিদারুণ পিপাসা ওই চোখে। যেমনটা আঁকা হয়েছে ঘরের মেঝেতে। দেব জ্ঞানে অধিষ্ঠিত বইটা। ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে যেমন যত্নে রাখা থাকে গীতা বা মহাভারত। সেইরকম। নীচে রাখা আছে একটা পেতলের বেশ বড়ো মাপের পাত্র। নিস্তব্ধতা চারিদিকে। বাইরে ঝি ঝি পোকা ডাকছে।

তনু আর হিয়া ঘরে ঢুকছে। টেনে হিচড়ে যাকে নিয়ে যাচ্ছে ওই ঘরে, সে সংজ্ঞাহীন। পুরুষালী ভারী শরীর। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে গাড়িতে আসার সময় খাবারের

সাথে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। নাহলে দুজনের পক্ষে সম্ভব নাকি এর সাথে পেরে ওঠা। এমনিতেই বৃহন্নলা দের শরীরে ভয়ানক শক্তি হয়। আর এখন তো ওরা দুর্বল। রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওদের। নীরবে কষ্ট সহ্য করে চলেছে দুজনে। হাতে সময় কম। তিনজনের পরণে শুদ্ধ বস্ত্র। চোখে চোখে কিছু কথা হল দুজনের। তারপর মানুষটিকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো মেঝেতে আঁকা চোখের উপরে। ত্রিভুজের বাকি দুটো দিকে গিয়ে বসল দুজনে।

তনু, তাড়াতাড়ি, সময় নষ্ট করিস না। ফিসফিস করে হিয়া বলে ওঠে।

তনু এবার তিনটে মোমবাতি রাখে ত্রিভুজের তিনটে দিকে। দুজনের সামনে দুটো, আর একটা বইটার সামনে। বইটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে প্রণাম করে দুজনে। যেভাবে শয়তানের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, কালো জাদু তে যেমন করা হয় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সেভাবেই অন্ধকারের গোলামের মত শ্রদ্ধা জানায়। তারপর ধীরে ধীরে তুলে নেয় পেতলের পাত্রে রাখা ধারালো একটা ছুরি। মোমবাতির ওই সামান্য আলোতেও চকচক করে ওঠে মন্ত্রপূত ছুরির ফলা। দুজনে একসাথে ছুরিটা ধরে চোখ বন্ধ

করে বলতে থাকে,

হে অন্ধকারের অধীশ্বর শয়তান। এই বৃহন্নলা কে আমরা উৎসর্গ করছি তোমায়। বলি গ্রহণ করো। আমাদের দাও অনন্ত যৌবন।

বলে আবার প্রণাম করে। তারপর মেঝেতে শায়িত মানুষটির গলায় চকিতে চালিয়ে দেয় হতে ধরে রাখা ছুরি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করে কাটা গলা থেকে। পিচকারীর রঙের মতো ছিটকে গিয়ে পড়তে থাকে বইটির উপরে। বইয়ের মলাটের শুকনো চামড়া ধীরে ধীরে সতেজ হয়ে উঠছে। টাটকা রক্ত আর কাঁচা চামড়ার গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরটা। বইটা থেকে অপার্থিব এক সবুজ আলো বেরোতে শুরু করেছে। দুজনে একসাথে গিয়ে বসল বইটার সামনে। নিচে রাখা পাত্র টাতে ফোঁটা ফোঁটা করে বইয়ের মলাট বেয়ে জমেছে বৃহন্নলা টির রক্ত। দুজনে সেই রক্ত পান করে। প্রসাদ। শয়তানের উপাসনার প্রসাদ।

কোন এক মন্ত্রবলে এবার বইয়ের পাতা খুলে গেছে। জীবন্ত অক্ষরগুলো বিচিত্র সুরে পড়তে শুরু করে দুজনে। বন্ধ দরজার বাইরে টোকা পড়ছে। শুনতে পায় না হিয়া বা তনু।

রজত টুম্পা আর সশস্ত্র ফোর্স হাজির হয়েছে তনু দের

দরজার বাইরে। Watchman ছেলেটা দেখিয়ে দিয়েছে ওদের ফ্ল্যাট টা।

দরজা খোলো, ভেতরে কে আছো দরজা খোলো।

রজত চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। কোনো উত্তর আসে না।

দরজা খোলো। নাহলে দরজা আমরা ভেঙে ফেলবো।

নাহ্। এবারও কোনো সাড়া শব্দ নেই।

রজত পিছন ঘুরে তার সাথে আসা ফোর্সের উদ্দেশ্যে বলে,

দরজা ভাঙো। আর অপেক্ষা করা যাচ্ছেনা।

অর্ডার পেয়ে বাকি পুলিশ গুলো একসাথে ধাক্কা দিতে দিতে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আসে। ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার। ড্রইং রুমের ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে ভিতরে। রজত এক ধাক্কায় খুলে ফেলে ভেজিয়ে রাখা বেডরুমের দরজা।পিছনে পিছনে যায় টুম্পাও। টর্চের তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে ঘরটা।

ঘরে ঢুকে বিশ্রী আঁশটে গন্ধ টায় গা গুলিয়ে উঠলো টুম্পার। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে সে।

অতর্কিত এসব ঘটনায় এতক্ষনে পিছনে ফিরে তাকায় হিয়া আর তনু। এতক্ষণ মন্ত্র পাঠ করে তাদের শরীরে

শক্তি ফিরে এসেছে। আর টুম্পা দেখে, তাদের সামনে রক্ত মাখা মুখে অমিত সুন্দরী দুই তরুণী। গোলাপ যাদের সাথে গিয়েছিল সেদিন, তাদের থেকে এদের বয়স প্রায় দশ পনেরো বছর কম। মৃত দেহটা তখনও সেখানেই পড়ে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে টুম্পা চিৎকার করে ওঠে আবার।

শয়তান। হারামজাদি। তোদের এত লোভ। চিরদিন বেঁচে থাকবার জন্য তোরা মানুষ টাকে খুন করলি?

অভিশপ্ত বইটা বন্ধ হতে শুরু করেছে। প্রাণপণে তনু চেষ্টা করতে থাকে বইটা খুলে রাখার। কিন্তু পারেনা। কমে আসতে থাকে মায়াময় আলোটা।

হিসহিস করে ওঠে হিয়ার গলা। আমাদের এত কষ্টের সাধনা তোরা নষ্ট করতে এসেছিস? চলে যা এখান থেকে। নাহলে শয়তানের কোপে পড়বি। কেউ বাঁচবি না।

টুম্পা আবার গর্জে ওঠে। মরতে হয় মরব। আগে তোদের শয়তানকে শেষ করবো, তারপর তোদের।

বলে হটাৎ ছুটে যায় ঘরের মাঝখানে। নিচে রাখা ছুরিটা তুলে নিলো।

না আ আ আ আ আ

চিৎকার করে টুম্পাকে আটকাতে চেষ্টা করে হিয়া আর

তনু। ততক্ষণে টুম্পা ছুরিটা গেঁথে দিয়েছে বইটার উপরে আঁকা চোখের মধ্যে। চোখটা থেকে গলগল করে বেরোতে শুরু করেছে গাঢ় লাল রক্ত।

টুম্পা রজত আর ঘরে উপস্থিত পুলিশ ফোর্স দেখলো এক অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত দৃশ্য। সুন্দরী তরুণী দুজন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। তাদের সামনে এখন পক্ককেশ লোল চর্ম দুই বৃদ্ধা।

প্রচণ্ড রাগে টুম্পা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে ওদের উপরে। রজত ধরে ফেলে ওকে। বলে,

টুম্পা, ছেড়ে দাও ওদের। তোমার যা করার তুমি করে দিয়েছো। বাকি কাজ পুলিশ করবে। খুনের দায়ে ফাঁসির সাজা পাবে ওরা। যদি ফাঁসি না ও হয়, জেলে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে। এই বুড়ো শরীর নিয়ে আর কতদিন বা বাঁচবে ওরা।

রজতের ফোর্স অ্যারেস্ট করে হিয়া আর তনু কে। মৃত বৃহন্নলা কে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসে।

গোলাপের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে টুম্পার। তার আদরের গোলাপের শেষ পরিণতি বুঝতে আর অসুবিধা হয় না। গোলাপ বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে টুম্পা।

নিদ্রাহীন রাত
শুভম ভট্টাচার্য্য

রিমোট জব করার সূত্রে, সারাজীবন আমেরিকার টাইমিং এ মেলাতে হয়েছে। ফলে রাতের ঘুমটার দফারফা অনেকদিনই হয়ে গেছে। রিটায়ারমেন্টের পরেও তাই অভিমানী রাতের ঘুম আমায় ত্যাগ করেছে। এতটা বেইমানি সেই বা মানবে কেন।
রাতের বেলা স্নায়ুকে বোকা বানিয়ে ঘুমোনোর অভ্যেসটাও চলে গেছে আমার। অবশ্য ঘুমের ওষুধ-টষুধ অনেক করেছিলাম। কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে কিছু কাজে দেয়নি। আর তারপর থেকেই রাতটুকু কে আর অছেদ্দা না করে, বরং উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি।
সামান্য একটু ভোদকা গ্লাসে ঢেলে বাড়ান্দায় বসে রাতে স্নিগ্ধতা উপভোগ করছিলাম। শহুরে রাত তখন বেশি না। সবে এগারোটা বেজেছে। তবে দূরদূরান্তে কোন শব্দ পাওয়া যায়না। গিন্নিরই ইচ্ছা তে এখানে ফ্ল্যাট কেনা। রাতে ওকে একা থাকতে হয় বলে, আমি অনেক বারন করেছিলাম সে সময়। কিন্তু তাঁর কথায় ভিড়ভাট্টায় ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আর শান্ত জায়গায় নাকি ক্ষতি কম। যদিও সে ক্ষতির ডেফিনেশনে আমি আর যাইনি। জীবনে দুটো মানুষের কথার ওপর আমি অবাধ্য হইনি। ছোটবেলায় আমার মা, আর বিয়ের পর আমার গিন্নি। তারা যা বলেছে, সব আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আজ এক পেগ খেয়েই কেমন যেনো মাথাটা করে উঠলো। হালকা আচ্ছন্নতা এলো শরীরে। অনেকদিন যে ঘুমের ধারেকাছে যাইনি, সেই ঘুম এর প্রাথমিক রুপ এরকম হয় কিনা সেও বলতে পারিনা। তবুও বাড়ান্দা থেকে উঠলাম না। বসে রইলাম ওখানেই। যে মানুষটার এত দিনেও ঘুম এলো না। তাঁর ঘুম আসবে হঠাৎ করে এটা ভাবা যায়না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষন বসার পরে যখন, আচ্ছন্নতা আরও বেশি করে গ্রাস করতে থাকলো আমায়, তখন আর পারলাম না। বিছানায় গিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। এ এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা। আজ অভিমানী ঘুম যখন আমার সাথে সখ্যতা চাইছে, তখন আমার শরীরের প্রত্যকটা অঙ্গ আমার থেকে ছুটি নিচ্ছে যেনো। হাত-পা সব যেনো অভিমান করে নেতিয়ে পরছে।
কখন ঘুমিয়ে পরেছি জানিনা। যখন ঘুম ভাঙলো, ঘড়িতে তখন রাত এক টা। ঘুমটা ভাঙলো কলিং বেলের আওয়াজে। এতরাতে কে আসতে পারে সেটা আমি জানিনা। দরজা খোলা টা কী ঠিক হবে? কিন্তু যে শরীর এতক্ষন আমার সাথে বেইমানি করছিলো। নেতিয়ে পরছিলো হাত-পা। তারাই যেনো এবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের স্বাভাবিক ভার যেনো আমার গায়ে আর লাগছেনা। মনে হচ্ছে তারা নিজেরাই যেনো উঠে পরছে। পা গুলো নিজে নিজেই হাঁটতে শুরু করেছে। আর আমাকে টানতে টানতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছতে নিজে থেকেই আমার হাত উঠে গেলো দরজার ছিটকিনির

দিকে। তারপর পরিচিত ভঙ্গিতে খুলে দিলো ছিটকিনি। তারপর নিজে থেকেই দরজার নবটা ঘুরিয়ে দিলো। এবার দরজাটা খুলে যাবে।
আমার মনের ভেতর তখন উথাল পাতাল চলছে। আগন্তুকের উদ্দ্যেশ্যে এক অদ্ভুত ভয় সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। নিজের শরীর কে আমি অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি তখন। সারা শরীরে ঘাম দেওয়ার কথা। কিন্তু সেও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে আজ। শরীর অদ্ভুত রকমের ভিজে অনুভব হচ্ছে। কিন্তু কই ঘামের চিহ্ন টুকু শরীরে নেই আমার।
দরজা খুলে যেতেই আমি থমকে গেলাম। এতক্ষন যা ভয় পাচ্ছিলাম সে ভয় কে এই ভয় ছাড়িয়ে যায়। বহুমাত্রায়। আমার সামনে এমন একজন আগন্তুক যে থাকবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সামনে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়। সে আমার গিন্নি।
গিন্নি যেদিন আমায় ছেড়ে চলে গেলো, সেদিনকেও তাঁর গায়ে এই পোশাকই ছিলো। একটা ঘিয়ে রঙের শাড়ি। আর লাল ব্লাউজ। শাড়ি তে সব জায়গায় ছিটে ছটে রক্ত লেগে। আর সবচেয়ে ভয়ানক ওই মাথাটা। মাথার পিছন দিকের খুলি টা, খুলে বেড়িয়ে এসেছে। বীভৎস। যেদিন গিন্নি ছাদ থেকে পরে গেলো। সেদিনও গিন্নিকে এইভাবেই দেখেছিলাম আমি। কিন্তু এতটা বীভৎস লাগেনি। কিন্তু আজ সেই রুপ দেখে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেলো।
বেশ কিছুক্ষন নিস্তব্ধ ছিলাম আমরা। আসলে আমার

কথা বলা সাজেনা। তবুও কিছু বলতে গেলাম আমি। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেড়োলো না। তারপর গিন্নিকে দেখলাম, সে কাঁদছে। আমি ভেবেছিলাম ওঁর চোখে হয়তো কোন প্রতিশোধের আগুন দেখতে পাব আমি। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে এই কান্নার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতকতার তীড় এসে লাগলো আমার বুকে।

শরীরে জোয়ান বয়সের আগুন ফুরিয়ে গেছে। তাই হয়তো আজ অনেক না বোঝা গুলো বুঝতে পারছি। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করলো আমার। কিন্তু পারলাম না। কেউ যেনো আমার গলা টিপে ধরে আছে। আমার যেনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছেনা। তাহলে কি যখন গিন্নিকে আমি ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম, ওরও এরকম কষ্ট হয়েছিলো। না-না আরও বেশি কষ্ট হয়েছিলো। আমার মিথ্যে সন্দেহের জন্য, আমি ওকে এতটা কষ্ট দিতে পারলাম? আজ যেনো আমার কাছে সব পরিষ্কার হতে থাকলো। আমি বুঝতে পারলাম। আমার অনুপস্থিতে গিন্নির কাছে কেউ আসতো না। সে নিজের স্বার্থ ছাড়াই আমাকে ভালোবেসে এসেছিলো এতদিন ধরে। আমি সেই সময় বুঝে উঠতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম, রাতের বেলায় স্বামী ছাড়া মেয়ে মানুষ থাকলেই বেলেল্লাপোনা করবে। আর সেই সন্দেহতেই...

আর ভাবতে পারলাম না আমি। ততক্ষনে গিন্নি পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। অদ্ভুত ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে আমার দিকে ফিরেই। আমি নিজেকে সামালাতে

পারলাম না। ছুটে গিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করলাম। ক্ষমা চাইতে গেছিলাম বোধহয়। কিন্তু পারলাম না। একটা ঝটকা আমায় পিছনে ঠেলে ফেলেদিলো। তারপর সব অন্ধকার। বেশকিছুক্ষন অন্ধকারের পর আবার ফুটে উঠলো আলো। এক অন্তহীন আলো।

অনেকবার বেল বাজানোর পরেও যখন বাবা দরজা খুললো না। তখন দরজা ভেঙেই ঢুকে এলো অনিমেষ। যা ভেবেছিলো তাই। বাবা আর নেই। বিছানায় নিঃসাড় দেহ পরে আছে। চোখটা খোলা। চেয়ে আছে উলটো দিকের দেওয়ালে মায়ের ছবিটার দিকে। মনে হলো, ছবি থেকে মা-ও যেনো চেয়ে আছে, বাবার দিকেই।

প্রতিশ্রুতি

মৃণাল চক্রবর্তী

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনাই ঘটে থাকে
আর সেই ঘটনার কোনো ব্যখ্যা আমাদের কাছে থাকেনা,
কাউকে সেটা বলতে গেলে এই আধুনিক সমাজে
নিছকই হাসির পাত্র হতে হয় আমাদের।

আমার জীবনেও সেইরকম এক ঘটনা যার ব্যখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি।

দিনটা ছিল ১৩ই অক্টোবর ২০১১ তিথি মতে সেদিন 'ভূত চতুর্দশী',
মানে কালী পুজোর আগের দিন অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষের পরে ১৪তম রাত, দাদু ঠাকুমার মুখে হয়তো আমরা সবাই শুনে থাকি সেইদিন বাইরে নিস্তব্ধ ফাঁকা জায়গায় যেতে নেই কারণ ভূতেরা নাকি সেদিন খুব শক্তিশালী হয় এবং এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই,
এরকম কথা ছোটোতে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি।

যাইহোক এখন বড় হয়ে গেছি বয়স প্রায় ২৪ হল তাই এসব আর মানিনা, তাই চারজন বন্ধু মিলে প্ল্যান করলাম এবারে কালী পুজোটা আমরা বাইরে কোথাও ঘুরতে যাব এবং সেখানেই কাটাবো, তাই কথা মত কালী পুজোর দুদিন আগে সব গুছিয়ে নিলাম একটা ব্যাগের মধ্যে কারণ কালী পুজোর আগের দিনই আমরা ময়ূরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো।

বলে রাখা ভালো আমার বাড়ির এখান থেকে আমি, অভি আর অনুরাগ এই তিনজন যাচ্ছি আর আমাদের যাওয়ার পথে নারায়ণ পুরে ঋষিকেশ উঠবে কারণ ওর ওখানে বাড়ি, ও আমাদের ফেসবুকের কমন ফ্রেন্ড তাই ভালোই পরিচয় ছিল আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে আর আমাদের ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান শুনে সে এক কথায় রাজি এবং প্রতিশ্রুতিও দেই যে সে আমাদের সাথে যাবেই।

আমরা অবশেষে ১৩ তারিখ বিকাল ৫ টাই রওনা দিলাম,
মনের মধ্যে তখন এক অন্যরকমই আনন্দ কাজ করছে আমাদের মধ্যে, বেশ মজা করে গান শুনতে শুনতে গল্প

করতে করতে যাচ্ছি আমরা তখন সন্ধ্যে ৭টা বাজছে
ঋষিকেশকে একটা কল করলাম কারণ নারায়ণ পুর
ঢুকতে আর কম করে প্রায় ১০ মিনিট লাগবে,
কিন্তু ঋষি ফোন তুলছে না আবার চেষ্টা করলাম কিন্তু
পরিষেবা সীমার বাইরে বলছে।

আমরা ভাবলাম হয়তো নেটওয়ার্ক নেই তাই ফোন
লাগছে না,
আর তো চলেই এসেছি ও হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে
ওখানে।

প্রায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা নারায়ণ পুর
ঢুকলাম দেখলাম একজন একটা ল্যাম পোস্টের নিচে
দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ভাবলাম ঋষিকেশই হবে, হ্যাঁ
ঠিকই ধরেছি ওটা ঋষিই।

যাইহোক ও আমাদের গাড়িতে উঠে এলো ওর সাথে
এই প্রথম দেখা আমাদের এর আগে যেটুকু আলাপ
সেটা শুধু ফেসবুকের মাধ্যমেই, গোটা রাস্তা ফাঁকা
আমরা গল্প করতে করতে চলছি ময়ূরগঞ্জের দিকে,
পুরো রাস্তা জুড়ে একটা গা ছমছমে পরিবেশ আর
এমনিতেও আজ ভূত চতুর্দশীর রাত একটু ভয় লাগছে

কিন্তু তাও মনে বেশ আনন্দ এই ভেবে যে বন্ধুরা মিলে একসাথে ঘুরতে যাচ্ছি।

গাড়িতে যেতে যেতে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আমরা সবাই
গল্প করছি মজা বলছি কিন্তু ঋষি কেমন যেনো চুপচাপ রয়েছে,
ওকে জিজ্ঞেস করলাম ;
-কি রে ঋষি তোর ভালো লাগছে না..?
-ও বললো হ্যাঁ কেনো ভালো লাগবে না
-তাহলে তুই কথাই বলছিস না, চুপ বসে আছিস কেন?
-আরে আমি সত্যিই খুব বেশি কথা বলিনা সেই ছোটো থেকেই।
-ওঃ আচ্ছা....
- ড্রাইভার দা অর্থাৎ আমাদের রাজু দা কে বললাম রাস্তায় একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়িটা দাঁড় করিও,

প্রায় ২ কিমি যাওয়ার পর গাড়িটা থামে একটা চায়ের দোকানে,

দোকানটার তিন দিকে দেওয়াল ওপরে খড়ের ছাউনি আর সামনেটাই একটা বসার জন্য বাঁশের বেঞ্চ, তো আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে ৫ জন সেখানে বসলাম আর দোকানের কাকা কে বললাম চা দিতে, ঠিক ২ মিনিট পর কাকা চার কাপ চা নিয়ে আমাদের দিলো।
-আমি বললাম আমরা ৫ জন আছি তো আর এক কাপ কই..?
-কাকা একটু মৃদু হেসে বললো ওঃ আর একজন গাড়ির ভিতরে আছে বুঝি...! দিয়ে সে আর এক কাপ চা আনতে গেলো দোকানের ভিতর।
-আমরাও ব্যাপারটা তখন গুরুত্ব দিনি, সবাই চা খেয়ে আবার গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম।

রাত তখন প্রায় ১০টা ৩৫ মিনিট আমরা ময়ূরগঞ্জের একটা কটেজে গিয়ে উঠলাম, একটা রুমে দুটো বেড চারজন থাকতে পারবে।
বেড গুলো বেশ বড়ই তাই ওখানের ম্যানেজারের সাথে কথা বলে একটা রুমে ৫ জন থাকতে দেওয়ার জন্য বললাম কারণ ড্রাইভার দা কে তাহলে আলাদা করে থাকতে হতো একা।
অনুরোধের পর ম্যানেজার সম্মতি দেই আমাদের ৫

জনকে একসাথে থাকার, কিন্তু ম্যানেজার আমাদের দিকে কেমন ভাবে যেনো তাকিয়ে ছিল আর গেটের দিকে তাকাচ্ছিল।

অবশেষে আমরা সবাই রুমে ঢুকলাম খুব ক্লান্তি শরীরের
মধ্যে, একটু পরেই কটেজের একজন এসে রাতের খাবার দিয়ে গেলো আমাদের, আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম আর কিছুক্ষণ পরেই একজন এলো আমাদের রুম থেকে খাবারের প্লেট গুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু লোকটি একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা প্লেট গুলোর দিকে সেটা একমাত্র আমি লক্ষ্য করলাম এবং কিছুক্ষন পর সেই প্লেটটা বাকি প্লেট গুলোর ওপরে চাপিয়ে লোকটা রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি আর এটা নিয়ে কাউকে কিছু বললাম না রাত অনেক হয়েছিলো তাই দেরি না করে সবাই শুয়ে পড়লাম এবং ওদের সাথে কাল কোথায় ঘুরবো এই প্ল্যান করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখটা জড়িয়ে এলো আর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা বুঝতেই পারিনি।

সকালে প্রায় ৭ টার দিকে বাড়ি থেকে মায়ের ফোন আসায় ঘুমটা ভেঙে গেলো তাই মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে বাকিদের ঘুম থেকে তুলে দিলাম কিন্তু ঋষিকে রুমে দেখতে পেলাম না,
দিয়ে কটেজের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখেছি ঋষি রয়েছে কিনা, ঠিক কিছুক্ষণ পরেই দেখি সামনে দিয়ে হেঁটে হাসছে ও
-আমি জিজ্ঞেস করলাম এত সকালে কোথায় গেছিলি?
-ও বললো আমার সকালে হাঁটার অভ্যেস আছে তাই আমি হাঁটতে গেছিলাম।
- আমি বললাম ; ও বেশ কিন্তু আমাদের আজ ডাকতে পারতিস আমরাও যেতাম তোর সাথে।
-আরে তোরা ঘুমাচ্ছিল তাই আর ডাকিনি তোদের আর এমনিতেও কাল দেরিতে ঘুমিয়ে ছিলি,
-বেশ ঠিক আছে রুমে চল।

তারপর আমরা রুমে গিয়ে একটু বসে আড্ডা দি এবং কিছুক্ষণ পরে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের জায়গা গুলো ঘুরে দেখার জন্য, মোটামোটি ভাবে জায়গা গুলো ঘুরে দেখলাম অনেক ছবি তুললাম আমাদের বেশ মজা করেই কাটলো সারাদিন,

খুব খিদে পেয়েছিলো তাই একটা দোকান দেখে রাজু দা কে গাড়িটা দাঁড় করাতে বললাম এবং রাস্তার ধারে দেখলাম চা, পুরি ঘুগনির দোকান তাই গাড়ি থেকে নেমে দোকানে গিয়ে পাঁচ প্লেট পুরি ঘুগনি দিতে বললাম, একটা টেবিলে চারটে চেয়ার তাই আর একটা চেয়ার অ্যাড করলাম আমাদের সাথে যাতে পাঁচজন একসাথে বসতে পারি, বসে গল্প করছি আমরা তখনই দোকানের কাকু চার প্লেট পুরি ঘুগনি আমার হাতে অভির হাতে অনুরাগের হাতে ও রাজুদার হাতে দিলো এবং আর এক প্লেট ঘুগনি টেবিলের ওপর নামিয়ে দিলো আমি ব্যাপারটা দেখে বেশ অবাকই হলাম তাও ব্যাপার আর গুরুত্ব না দিয়ে বললাম ঋষি তুলে নে প্লেটটা আর যদি পুরি লাগে তাহলে বলবি,

যাইহোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে দিলাম গাড়িতে উঠতে যাবো তখনই কানে এলো দোকান থেকে কাকুটা ওদের এক কর্মচারীকে বলছে
-এখুনি খেয়ে গেলো ওদের টেবিলে দেখ একটা প্লেট ফুল আছে হয়তো ওরা খাইনি এঁঠুও করেনি তাই ওটা তুলে রেখে দে।

গাড়িতে যেতে যেতে অভি আমাকে বললো দোকানদার কি বলছিল শুনলি তুই দীপ..?
-আমি বললাম হ্যাঁ ওই ফুল প্লেট তুলে রেখে দেওয়ার কথাটা তো?
-অভি বললো হ্যাঁ রে, কিন্তু আমরা তো সবাই খেয়েছি প্লেটে তো কিছু থাকার কথা না,
-আমি বললাম হ্যাঁ রে আমিও সেটাই ভাবছি।

কিছুক্ষন পর কটেজে এসে পৌঁছলাম এবং স্নান করলাম একটু পরেই খাবার দিয়ে গেলো খেলাম কিন্তু সেদিনের মতো আজও সেই লোকটা প্লেট গুলো নিয়ে যাওয়ার সময়ে ঋষির বেডের পাশে টেবিলে থাকা প্লেট টার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হলো সে হয়তো ভাবছে প্লেট টা নেবো কি নেবোনা এবং শেষমেশ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্লেট টা তুলে নিয়ে চলে গেলো।

এভাবেই সেখানে দুদিন কাটিয়ে আজ অর্থাৎ ১৫ তারিখ বিকালে বাড়ি ফিরবো বলে ঠিক করলাম এবং বিকাল ৫ টার দিকে রেডি হয়ে গাড়িতে উঠলাম সবাই ঠিক তখনই ঋষি বললো আমি রুমে আমার হাত ঘড়িটা ফেলে এসেছি তোরা বোস আমি নিয়ে আসি।

আমরা গাড়িতে বসে আছি অনেকক্ষণ হয়ে গেলো কিন্তু ঋষি তখনও এলো না তাই এক প্রকার বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে রুমে গেলাম গিয়ে দেখি রুম লক করা অবাক হয়ে গেলাম এবং ম্যানেজারকে ডেকে বললাম

আমাদের এক ফ্রেন্ডের ঘড়িটা রুমে ফেলে গেছে তাই সে রুমে এসেছিল ঘড়িটা আনতে আপনারা কেউ দেখেন নি?

-ম্যানেজার বললো না তো আপনারা যাওয়ার পরই রুম লক করে দিয়েছি এর পড়তো আর কেউ আসেনি এলে তো জানতে পারতাত আমরা। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস করার ছিল আপনাদের,

-আমি বললাম হ্যাঁ বলুন

-আপনাদের সাথে কজন ছিল?

-আমি বললাম ৫ জন ছিল, কিন্তু কেনো?

-ম্যানেজার বললো কিছু মনে করবেন না কিন্তু আমি আমাদের সাথে টোটাল চারজনকেই দেখেছিলাম, পাশে থেকে কটেজের একজন বললো হ্যাঁ বাবু আমিও আপনাদের সাথে একজনকেই দেখেছিলাম।

-আমি তো শুনে অবাক বিশ্বাসই হচ্ছেনা কোনো ভাবে এবং মাথায় কিছুই ঢুকছে না। গাড়ির ওখানে ফিরে

গিয়ে বাকিদের পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম তারাও শুনে অবাক, তৎক্ষণাৎ অভি ঋষির ফোন ফোন করলো কিন্তু পরিষেবা সীমার বাইরে বলছিল কোনো ভাবেই ফোন লাগছিল না। তাই আর অপেক্ষা না করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম যেতে যেতে মাথার মধ্যে শুধু এই গুলোই ঘুরপাক খাচ্ছে, রাজু দা কে বললাম
-রাজু দা গাড়িতে নারায়ণ পুরের ভেতরে ঢুকিয়ো ঋষির বাড়িতে বলা উচিত কারণ ও আমাদের সাথে গেছিলো, ওর বাড়িতে জানানো এটা আমাদের কর্তব্য।

রাত প্রায় ৯ টার দিকে নারায়ণ পুর ঢুকলাম কিন্তু ঋষিকেশের বাড়ি আমরা কেউই চিনিনা তাই কিছুটা গিয়ে একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম
-আচ্ছা দাদা এখানে ঋষিকেশ ব্যানার্জির বাড়ি কোনটা?
-সে সামনে রাস্তা দেখিয়ে বললো সোজা গিয়ে ডান দিকে একটু গেলেই ওর বাড়ি।
-আমরা সেই মতো গেলাম এবং দেখলাম একটা বাড়ির সামনে প্যান্ডেলের বাঁশ নামানো রয়েছে আর কিছু লোক দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলাম

- এইযে কাকু শুনছেন?
-হ্যাঁ বাবা বলো! কিছু বলছিলে?
-আচ্ছা এটা কি ঋষিকেশ ব্যানার্জির বাড়ি?
-বললো হ্যাঁ বলো, আমি ঋষির ছোটো কাকা।
-আমি বললাম ও আচ্ছা
দিয়ে আমি ঋষির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে যাবো ঠিক তখনই
কাকু কেঁদে উঠে বললো কি থেকে কি হয়ে গেলো গো গ্রামের দুটো ছেলের সাথে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে এলো না গত পরশু দিন সকালে নদীর পাড়ে তার মৃতদেহ পাওয়া গেলো।

-আমরা তো শুনে অবাক, কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, এইসব ভাবতে ভাবতে আর দেরি না করে তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ওখান থেকে।

গাড়িতে যেতে যেতে সব মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সব ঘটনা গুলো আসতে আসতে পরিস্কার হয়ে আসছে আমাদের,
আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ ঋষি কে দেখতে

পেতো না,
-তাই যাওয়ার দিনে চায়ের দোকানের কাকু চার কাপ চা দিয়েছিলো আমাদের।
-সেই জন্যই কটেজের লোকটা খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকতো ওই ভাবে কারণ সেই একটা প্লেট সব সময়ে ফুল হয়েই থাকতো কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম না সেটা।
-আর সেদিন রাস্তায় টিফিন খাওয়ার জন্য যখন গেছিলাম তখন ওই জন্যই দোকানের কাকু বলেছিলো একটা প্লেট ফুল আছে ওটা তুলে রাখতে।

-হঠাৎ অভি বললো আমরা তো একসাথে অনেক ছবি তুলেছি সেগুলো দেখতো,
-আমি আমার ফোনটা বের করে ছবি গুলো দেখেই হতভম্ব হয়ে গেলাম, দেখি একটা ছবিতেও ঋষি নেই কিন্তু তখন দেখেছিলাম ও ছিল।

এবার সব পরিস্কার হয়ে গেলো এতক্ষণে কি করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।
নিজেদের কোনো রকমে তখন সামলে নিয়ে বাড়ি

ফিরলাম,
বাড়িতে এসে কাউকে কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম
এবং রাত্রে স্বপ্নে দেখি ঋষি আমাকে বলছে
-ভয় পাসনা তোদের সাথে ঘুরতে যাবো তার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলাম তাই আর না গিয়ে পারলাম না বন্ধু ভালো
থাকিস তোরা আমি আসি।
পরের দিন সকালে বাকিদের ফোন করতেই তারাও
ঠিক একই স্বপ্ন দেখে আর আমাকে বলে।

এর পর আর কোনোদিন ঋষি আমাদের স্বপ্নে আসেনি।

ডাক

অমৃতা ব্রহ্ম

পরকাল সম্বন্ধে আমরা সকলেই কমবেশি অজ্ঞ। তবে শুনেছি কারোর পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় হলে নাকি সেখানকার বাসিন্দারা আসেন, তাঁদের প্রিয়জনকে ডেকে নিয়ে যেতে।

এরকমই একটি ঘটনার গল্প শুনেছিলাম আমার দাদুর কাছে। তিনি আবার শুনেছিলেন তাঁর জনৈক গুরুভাইয়ের কাছে!

যাক! এবার ঘটনায় আসি।

উনিশশো বারো/চোদ্দো সালের কথা।সদ্য-বিপত্নীক যামিনীরঞ্জন গুপ্তকলকাতা হাইকোর্টের ওকালতির পাট তুলে দিয়ে কাশীর পৈতৃক বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি।

যামিনীরঞ্জনের কাশীর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম বেশি হত না। কেবল পুজোর সময়ে দুই ছেলে সপরিবারে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। তাই বলে, তিনি মোটেই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন না। পরোপকারী, পরিহাসপ্রিয় যামিনীরঞ্জন অল্প দিনের

মধ্যেই বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে স্থানীয় সবারই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর একতলার সুপ্রশস্ত বৈঠকখানাটি নিয়মিত সান্ধ্য আড্ডা ছাড়াও নববর্ষে, বিজয়াদশমীতে, দোলে, জন্মাষ্টমীতে অতিথি-সজ্জনে পূর্ণ থাকত।

এইভাবে কাশীতে বছর বারো কাটানোর পর এক শারদোৎসবের শেষে ঘটনাটি ঘটল।

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় প্রত্যেক বছরের মতো সেবারেও যখন যামিনীরঞ্জনের বাড়িতে তাঁর বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছিলেন আর প্রৌঢ়-বৃদ্ধরা মিলে সাদর কোলাকুলির শেষে, সিদ্ধির সরবৎ,লাড্ডু, নিমকি, প্যাঁড়ার সঙ্গে গল্পে গল্পে চলছিল শুভ বিজয়া পালন, ঠিক সেই সময়েই বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়ালেন এক সধবা ভদ্রমহিলা। তিনি যামিনীরঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " এবার চলো.. "

সমবেত ভদ্রলোকেরা তাঁদের অপরিচিতা এই মহিলার আগমনে ও কথায় বেশ কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। সেই সময়কার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নিরিখে, এভাবে প্রকাশ্যে কোনো ভদ্রমহিলার, হতে পারে তিনি গৃহস্বামীর বিশেষ পরিচিতা, তবুও এভাবে সম্বোধন করাটা বেশ অশোভনই ছিল, বাংলাদেশের

বাইরে তো বটেই!

তাঁদের বিস্ময়-বিমূঢ়তার মাঝেই যামিনীরঞ্জন খুব স্বাভাবিকভাবে,"এসে গেছ?চলো তাহলে.. " বলে যেন কোথাও যাবার জন্যই তাঁর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং পরমূহুর্তেই টলে পড়ে গেলেন মাটিতে-কার্পেটের ওপর। মহা গোলযোগ উঠল ঘরে, মাথায় উঠল পানভোজন। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কাশীর তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ নিত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার ভীত দৃষ্টির সামনে তিনিই পরীক্ষা করে জানালেন, যামিনীরঞ্জন মৃত। আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর। শুনে, অতিথিরা, বেশিরভাগই যামিনীরঞ্জনের কমবেশি সমবয়স্ক বৃদ্ধ, খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। অসুস্থও হয়ে পড়লেন কেউ কেউ। সেই গোলযোগের মধ্যে, রহস্যময়ী সেই নারী যে কোথায় চলে গেলেন, তাঁর খোঁজ করার কথা কারোরই মাথায় এলো না।

বিস্মিত যামিনীরঞ্জনের ছেলেরাও কিছু কম হন নি। ঘটনার সময়ে তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। কাশীতে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবও কিছু কম নেই। গিয়েছিলেন তাঁদের একজনের বাড়িতেই-বিজয়া করতে। বৌমারা দুর্গাবাড়িতে গিয়েছিলেন সিঁদুর

খেলতে।নাতি-নাতনিরা তাদের মায়েদের সঙ্গেই ছিল। বাড়ির লোক বলতে,কাজের লোক ভীখু ছিল দোতলায়। নীচে হৈ-চৈ শুনে নেমে এসে ব্যাপার দেখে সে ছুটল খবর দিতে। খবর পেয়ে ছুটে এসে যখন সব শুনলেন, শোকের থেকে বিস্ময়টাই যেন তাঁদের বেশি হল।

"…. কে ঐ মহিলা? বাবাকে কোথায় যেতে বলেছিলেন?তিনি নিজেই বা কোথায় চলে গেলেন? এই ঘটনার পর একবারও এলেন না কেন?"….. নিজেদের মধ্যে বহু আলোচনায়ও এসব প্রশ্নের উত্তর পেলেন না দুই ভাই।

উত্তর পেলেন ক'দিন বাদেই। বন্ধুর মৃত্যু শোক সামলে উঠে, বন্ধুপুত্রদের সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন জনার্দন চতুর্বেদী, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপকদের একজন। । সদর দরজা খোলা ছিল। কাজের লোকটি হয়তো কাছেই কোথাও গিয়েছিল। একতলা অন্ধকার দেখে তিনি উঠে এলেন ওপরে-এই প্রথম। এর আগে কখনো এই বাড়ির দোতলায় ওঠেন নি তিনি। যামিনীরঞ্জনের শোবার ঘরে বসেই তখন দুই ভাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিমন্ত্রিতদের তালিকা লিখছিলেন। তাঁদের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা ছিলেন ভিতর দিকের ঘরে।

যাই হোক, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে, বেরিয়ে এসে পিতৃবন্ধুকে ঘরে নিয়ে গেলেন তাঁরা। বসতেও বললেন। তবে চতুর্বেদী বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি তখন সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ। দেওয়ালে ঝোলানো যামিনীরঞ্জনের পরলোকগতা স্ত্রীর অয়েলপেন্টিংটার দিকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, "এই তো! সেই ভদ্রমহিলা, ঐ দিন যিনি এসে গুপ্তাদাদাকে ডেকেছিলেন, কে ইনি? "

দুই ভাইয়ের মুখে কোনো কথা যোগাল না। বিচক্ষণ বৃদ্ধ চতুর্বেদীও বুঝতে পেরেছিলেন, এ ঘরে, এত বড়ো কার ছবি থাকতে পারে!

নির্বাক তিনজনের চোখের সামনে, ঘরের টেবিলের ওপর অস্থায়ীভাবে রাখা যামিনীরঞ্জনের ছবির সামনে ধূপের ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঘুরছিল। ধোঁয়ার মধ্যে মনে হল যেন যামিনীরঞ্জনের মুখে একচিলতে হাসি খেলে গেল।

অমাবস্যার_রাত

সুচন্দ্রা চক্রবর্তী

- 'সুমি তাড়তাড়ি করো।লেট হচ্ছে কিন্তু এবার!'
- 'এই তো অভ্র,আর যাস্ট পাঁচ মিনিট ওয়েট করো প্লিজ,আমার হয়ে গেছে।'
- 'আসলে বুঝতেই তো পারছ গ্রামের রাস্তা,তাই বেশি রাত করতে চাইছি না।এমনিতেই এখন চারটে বাজে,গ্রামে ঢুকতে ঢুকতে ন'টা বাজবে।'

অভ্রদীপ আর সুমনার বিয়ে হয়েছে মাসদুয়েক হল। কর্মসূত্রে অভ্রদীপ কলকাতায় থাকে মা বাবাকে সাথে নিয়ে।ওদের দেশের বাড়ি বর্ধমানের এক অখ্যাত গ্রাম চন্দ্রপুরে।বিয়ের পর থেকেই অভ্রদীপের বাবা মা পলাশবাবু আর শিলাদেবী বারবার ছেলেকে বলছেন সে যেন নতুন বৌকে নিয়ে দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসে,কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় অভ্রের সময় হয়ে উঠছিল না।এতদিন পর অফিসে ছুটি পেয়েছে অভ্র,তাই রওনা দিচ্ছে চন্দ্রপুরের দিকে,সুমনাকে সঙ্গে নিয়ে।এমনিতেই গ্রামের কাঁচা রাস্তা,সেভাবে আলো নেই,তার ওপর পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে,তাই অভ্র তাড়া দিচ্ছে সুমনাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেডি হয়ে বেরোলো অভ্র-সুমনা বাড়ির গাড়ি নিয়ে।ড্রাইভার যদিও আছে,তবু অভ্রের ইচ্ছা ও নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে সুমনাকে।

গাড়ি চলতে লাগল।মহানগরীর ব্যস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে লাগল গাড়ি,আর গুনগুন করে গল্প করতে লাগল সদ্য বিবাহিত দুই যুবক-যুবতী।ধীরে ধীরে আলোকজ্জ্বল সরণি পেরিয়ে কাঁচা লালচে রাস্তা ধরল গাড়ি।আজ অমাবস্যা।এতক্ষণ আলোর দাপটে অমাবস্যার মায়াজাল চোখে পড়েনি ওদের,কিন্তু লালচে কাঁচা রাস্তা ধরতেই অমাবস্যার মোহময়ী রূপ হাতছানি দিতে লাগল ওদের।সুমনার হঠাৎ মনে হল,এ যেন রাত নয়,অপার রহস্যময়ী এক নারী,যে কেবলই আহ্বান করছে তাকে নিজের দিকে,এক অজানা শক্তিতে আকর্ষণ করছে নিজের দিকে।

- 'ওভাবে কি দেখছ সুমি?জানলার বাইরে?' অভ্র হাসিমুখে প্রশ্ন করল তাকে।

- 'জানো অভ্র,শহরে বড়ো হয়েছি তো ছোট থেকে,অমাবস্যার অন্ধকার কথাটা শুনেছি,কিন্তু নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়নি সেভাবে।কে বলে যে শুধু জ্যোৎস্নার রাতই সুন্দরী?অমাবস্যার অন্ধকারের সৌন্দর্যও কি কম?'

- 'বাহ,তুমি তো বেশ প্রকৃতিপ্রেমী!' বাঁকা হেসে বলল অভ্র।

- 'হুম,তা তুমি বলতেই পারো!' একগাল হাসল সুমনা।

জনবসতিহীন নিস্তব্ধ রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে অভ্রদের গাড়ি,রাস্তার দুপাশে ঘন জঙ্গল। রাত তখন সবে আটটা,অথচ চারপাশের পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে যেন গভীর রাত।

- 'আর ঘন্টাখানেক,তার পরেই চন্দ্রপুর ঢুকব আমরা,'অভ্র বলল।

- 'আচ্ছা অভ্র,দেশের বাড়িতে কে কে আছে গো?'

- 'সে তো তুমি গেলেই দেখতে পাবে ডার্লিং,' অভ্র মুচকি হেসে বলল,'ওটা না হয় সিক্রেট থাক!'

- 'ধ্যাত,তোমার সবেতেই খালি ইয়ার্কি,' সুমনা অভ্রর বাঁ হাতটা ধরে বলল,'বলোই না অভ্র!'

অভ্র হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল,হঠাৎই সাদা শাড়ি পরিহিতা এক নারী চলে এল ওদের গাড়ির সামনে।কোনোরকমে ব্রেক কষল অভ্র।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামল অভ্র আর সুমনা।সাদা শাড়ি পরিহিতা একটি যুবতী পড়ে গেছে গাড়ির ধাক্কায়। সেভাবে কিছু হয়নি তার,কেবল পড়ে গিয়ে হাত পা

ছড়ে গিয়েছে।ওরা তাড়তাড়ি তুলল তাকে।
- 'আপনার লাগেনি তো?' উদ্বিগ্ন সুমনা প্রশ্ন করল।
- 'এইভাবে কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটে?একটু দেখে চলাফেরা করবেন তো!' অভ্র বলল।
- 'আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না,' যুবতী হেসে বলল,'আমি ঠিক আছি।'
- 'কিন্তু এমন নির্জন রাস্তায় আপনি একা একা কি করছেন?'
- 'ধুস,কি যে বলেন,কোথায় নির্জন!এখানে তো দিব্যি লোক বাস করে,ওই দেখুন!' বলেই মেয়েটি আঙুল দেখাল।ওর আঙুল বরাবর ওরা তাকিয়ে দেখল,একটা ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে।স্মিত হেসে মেয়েটি বলল,'ওখানেই আমার বাড়ি।'
- 'আচ্ছা চলুন আমরা আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি,' অভ্র বলল,'আপনি ইনজিওরড হয়েছেন,একা একা এতটা যেতে পারবেন না।'
- 'আচ্ছা বেশ,চলুন তবে।'
মেয়েটিকে অনুসরণ করতে এগোতে লাগল ওরা।প্রায় দশমিনিট হাঁটার পর ওরা পৌঁছাল।
এক বিশাল রাজবাড়ি।চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে।

- 'এই আমাদের বাড়ি,আসুন,ভেতরে আসুন আপনারা।'

মেয়েটি বসার ঘরে নিয়ে এল ওদের দুজনকে।সেখানে এক প্রৌঢ় বসেছিলেন।

- 'ইনি আমার বাবা সূর্যনারায়ণ চৌধুরী।আর বাবা,এনারা হলেন অভ্র আর সুমি,' বলেই সবটা খুলে বলল মেয়েটি।

- 'আপনি আমাদের নাম জানলেন কিভাবে?আমরা তো আপনাকে বলিনি!'অবাক গলায় প্রশ্ন করল অভ্র।

- 'হুম,আমায় সরাসরি বলেননি,কিন্তু রাস্তায় আসার পথে আপনারা নিজেদের একে অপরের নাম ধরে ডাকছিলেন,তাই জানতে পারলাম।' স্মিত হাসল মেয়েটি।

- 'আচ্ছা এই ব্যাপার,তবে আপনার একটু ভুল হয়েছে!'

- 'কি রকম?'

- 'আমার নাম অভ্রদীপ,আর ওর নাম সুমনা,আমরা একে অপরকে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকি,আপনি সেটাই শুনেছেন।'

- 'আচ্ছা বাবা,বুঝলাম।'সূর্যবাবু হেসে বললেন,'তোমরা অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছ,ক্লান্ত আছ।এখন বোসো তো!আর অরু মা,তুই বা কেমন বল দিকি!

ওদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর!'
- 'না না আঙ্কেল,আমাদের নিয়ে ভাববেন না,আমরা ঠিক আছি একদম।' অভ্র বলল,'আর বাই দ্য ওয়ে,আপনার নাম কি?আপনার নামটাই তো জানা হল না!'
- 'আমি অরুণিমা সেন।মা বাবা অরু বলে ডাকে।'
- 'সেন?'
- 'হ্যাঁ বাবা,আমার মেয়েটা আসলে বিবাহিত,কিন্তু আমি আমার কাছেই রেখেছি অন্য কারণে।সেসব অনেক গল্প,পরে বলা যাবে তোমাদের,কেমন?'
- 'আচ্ছা আঙ্কেল,তাই হবে।'
- 'হ্যাঁ গো বাবা,মা কই?এসে থেকে মা কে দেখছি না তো!'
- 'গেস্টরুমটা পরিষ্কার করছিলাম রে,অভ্রদীপ আর সুমনা তো আজ ওই ঘরেই থাকবে,সেইজন্য!' এক প্রৌঢ়া এসে বললেন।
- 'তা বেশ করেছ মা!'অরুণিমা সুমনাদের দিকে ফিরে বলল,'এই হল আমার মা,সান্ত্বনা চৌধুরী।'
- 'আচ্ছা,কিন্তু একটা জিনিস বুঝলামা না আন্টি,আপনি তো একবারও বসার ঘরে আসেন নি,তাহলে আপনি আমাদের কথা জানলেন কিভাবে?'

- 'রান্নাঘর থেকে বাবা।রান্না করছিলাম,আর তখনই তোমরা এলে।আসলে রান্নাঘর থেকে বসার ঘরটা পুরো দেখা যায়,সব কথাও শোনা যায়।'
- 'বাহ,এ তো চমৎকার ব্যাপার!' সুমনা বলল।
- 'কিন্তু আন্টি,আমরা রাতে এখানে থাকতে পারব না,এখান থেকে এখনো একঘন্টা যেতে হবে আমাদের!'
- 'কোথায় যাবে?চন্দ্রপুর?'
- 'হুম,আমরা চন্দ্রপুরই যাব,কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন বলুন তো?' হতবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অভ্র-সুমনা।
- 'অত অবাক হোয়োনা তোমরা,' সূর্যবাবু হেসে বললেন,এখান থেকে ঘন্টাখানেক দূরে মানুষের বাসযোগ্য জায়গা ওই চন্দ্রপুরই আছে।'
- 'মানে?' সুমনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।
- 'সুমি তুমি জানোনা,আসলে চন্দ্রপুরের আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত কোথাও কোনো বসতি নেই,চন্দ্রপুর একটা বিচ্ছিন্ন গ্রাম বলা যায়,সেটাই বলতে চেয়েছেন ওনারা।'
- 'ওও আচ্ছা।'
- 'কিন্তু আঙ্কেল,আমাদের প্লিজ রাতে এখানে থাকতে বলবেন না,আসলে দেশের বাড়ির সকলে বসে আছে

নতুন বৌকে দেখবে বলে...'

- 'তা বেশ তো,কাল সকালটা হোক,তারপরেই না হয় যেও তোমার বৌকে নিয়ে,' সান্ত্বনাদেবী বললেন।

অভ্রদীপ কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না,কিন্তু সুমনার সে রাতে আর রাস্তায় বের হতে ইচ্ছা করছিল না,তাই সুমনার কথায় শেষমেশ রাজি হল অভ্র।

সুমনা আর অভ্র রাতে ডিনার করার পর অরুণিমা আর সান্ত্বনাদেবী বললেন,'অভ্র,তুমি গেস্টরুমে চলে যাও বাবা,সুমনা একটু পরে যাবে।'

- 'কিন্তু কেন আন্টি?'

- 'কেন আবার!তোমার বউ কি পরে আছে দেখেছ? একখানা ভারী বেনারসি!ওটা পরে ঘুমোতে পারবে ও? সেজন্যই একটা হালকা শাড়ি দিচ্ছি ওকে,যেটা পরে ও আরাম পাবে।'

সুমনাকে একরকম জোর করেই অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন অরুণিমা আর সান্ত্বনাদেবী।এরপর অরুণিমার ঘরে ওকে এনেই ঘরের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন মা মেয়ে।

- 'এ কি আপনারা হঠাৎ দরজাটা...'.

- 'বলব মা,সবটা বলব।আগে তুমি বসো দেখি!' বলেই সুমনাকে পালঙ্কে বসিয়ে দিলেন ওরা।এরপরেই হঠাৎ

সুমনার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিল অরুণিমা,তারপরেই ফোনটা ঘাঁটতে লাগল।

- ' একি!কি করছেন টা কি আপনি!আপনাদের উদ্দেশ্য মোটেও সুবিধার লাগছে না কিন্তু আমার!'

- 'আমাদের উদ্দেশ্য ভালো না খারাপ,সেটা তো একটু পরেই টের পাবে তুমি!'

- 'মানে?দেখুন আমি কিন্তু এবার চিৎকার করব,কি চান কি আপনারা?'

- 'বেশ,চিৎকার করবে,আগে এই ভিডিওটা দেখে নাও দিকি!' বলেই সুমনার মোবাইলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল অরুণিমা।

মোবাইলে একটা ভিডিও চলছে।ভিডিওতে অভ্র,আর অভ্রের মা বাবাকে দেখা যাচ্ছে।কিছু একটা কথোপকথন চলছে ওদের মধ্যে।সাউন্ডটা বাড়িয়ে নিল সুমনা।এরপর ভালোভাবেই স্বামী আর শ্বশুর শ্বাশুড়ির কথোপকথন শুনতে পেল সুমনা।হতবাক হয়ে গেল ও। তিরিশ মিনিটের ভিডিও ছিল সেটা।ভিডিওর কথোপকথনের সারমর্ম এটাই,যে অভ্র আর তার মা বাবা সুমনাকে খুন করতে চায়।বিয়ের পর বারবার দাবি করা সত্ত্বেও সুমনা বাপের বাড়ি থেকে মোটা অঙ্কের পণ আনতে অস্বীকার করেছে যে!সুমনা এও

জানতে পারল ভিডিওটা থেকে,যে আসলে আজ অভ্র সুমনাকে চন্দ্রপুরে নিয়ে যেত না,চন্দ্রপুর আসার ঠিক আগেই একটা নদী আছে।সে নদীর দিকে সচরাচর কেউ আসেনা,কারণ সেদিকটা জনবসতিহীন।অভ্রদের প্ল্যান ছিল,সুমনাকে খুন করে সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

গোটা ভিডিওটা দেখে শিউরে উঠল সুমনা।হতাশ হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে।

- 'বোন,এটা ভেঙে পড়ার সময় নয়!যত তাড়তাড়ি সম্ভব তোমায় ওই শয়তানটার হাত থেকে পালাতে হবে,নইলে ও তোমায় ছেড়ে দেবে না!'চিন্তিত গলায় বলল অরুণিমা।

- 'কিন্তু একটা কথা বলুন তো,এই ভিডিওটা তো আমার মোবাইলে ছিল না,আপনারা এটা কোথায় খুঁজে পেলেন?'

- 'আহ,এখন এসব ভাবার সময় নয় সুমনা!' সান্ত্বনাদেবী বললেন,'এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাও!'

সুমনার তখন কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। অরুণিমা কোনোরকমে ওকে রাজবাড়ির বাইরে নিয়ে এল।অভ্র তখন গেস্টরুমে।বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল,আর ড্রাইভারও ছিল,অরুণিমা সুমনাকে

বলল,'ভয় নেই।এ আমাদের রাজবাড়িরই গাড়ি,আর ও শ্যামলাল,আমাদের পুরোনো ড্রাইভার।'

ড্রাইভার সে রাতে সুমনার বাপের বাড়ির গেটেই নামিয়ে দিল তাকে।তখন রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। সুমনা গাড়ি থেকে নেমে বলল,'আপনি এতটা দূর কষ্ট করে এলেন আমায় পৌঁছে দিতে,ভেতরে আসুন না!'

- 'না দিদিমণি,আমার কাজ ছিল নিরাপদে আপনাকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া।আমার কাজ শেষ।আমি আসছি।' শ্যামলাল গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

পরেরদিন সকালে নিউজ চ্যানেল খুলেই চমকে উঠল সুমনা।চন্দ্রপুর থেকে ঘন্টাখানেক দূরে এক জঙ্গলে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।তার আইডি কার্ড দেখে জানা গেছে,তার নাম অভ্রদীপ জানা।কলকাতার এক বেসরকারি অফিসে সে কর্মরত ছিল।তার মৃত্যুর কোনো সঠিক কারণ পাওয়া যায়নি,শুধু দেখা গেছে,চোখদুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে।সম্ভবত ভয়েই তার মৃত্যু হয়েছে বলেই অনুমান করছে পুলিশ।

এই ঘটনার অনেকদিন পর একবার সেই রাজবাড়ির খোঁজে গিয়েছিল সুমনা।কিন্তু কোথায় রাজবাড়ি!সেখানে শুধুই ভগ্নাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।চন্দ্রপুর গ্রামে সে গিয়েছিল এই রাজবাড়ির ব্যাপারে জানার

জন্য।সেখানকার স্থানীয়দের মুখে মুখে সে যা জানতে পেরেছিল,তা হল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যিই এক রাজবাড়ি ছিল সেখানে,জনবসতিও ছিল। কিন্তু হঠাৎই ঘটে গিয়েছিল এক দুর্ঘটনা।শোনা যায়,সে বাড়ির একমাত্র মেয়ে অরুণিমা মারা যায় শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই চক্রান্ত করে খুন করেছিল তাকে।একমাত্র মেয়ের অপমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি মা বাবা।শোনা যায়,তাঁরা মেয়ের চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন,আর সেই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই অরুণিমার শ্বশুরবাড়িতে এক বীভৎস অগ্নিকান্ডে সেই বাড়ির সকলে মারা যায়।

সুমনা আজও অরুণিমা,সূর্যবাবু,সান্ত্বনাদেবীকে ভুলতে পারেনি।ভুলতে পারেনি সেই অমাবস্যার রাতকেও।

লকেটের খোঁজ

শ্রীতম রায়

বই পত্র গুছিয়ে নিয়ে সামলে সুমলে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম বেশ রাত হয়েছে। সামনে পরীক্ষা। স্যার এতক্ষণ আমাকে পাখি পড়ার মতো করে বোঝাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গী-সাথীরা অবশ্য আগেই চলে গেছে।আমি একা এতক্ষণ বসে পড়াশোনা করছিলাম । আলোকিত ঘরের মাঝে বসে খেয়ালই করতে পারিনি রাত কখন গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেছে গভীরতার দিকে।

উঠে আসার সময় স্যার বলেছিলেন-'আজ অনেকে রাত হয়ে গেল তোর,বাড়ি ফিরবি কি করে?'

আমি বললাম- 'দেখছি স্যার এখনও দু-একটা বাস চলছে বোধহয় দেখি ধরতে পারি কি-না?'

'না হলে অটো- টোটো যা পাবি ধরে বাড়ি ফের। রাস্তায় অযথা দেরি করার দরকার নেই..।'

---'হ্যাঁ স্যার,তাই করছি, ' বলে তড়িঘড়ি স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্জন খাঁ খাঁ গলিটা প্রায় দৌড়ে পার হয়ে, বড় রাস্তার বাসস্টপেজে এসে দাঁড়ালাম।

হাত ঘড়িতে দেখলাম পৌনে এগারোটা বাজে।

এমনিতে ছুটি হয় রাত সাড়ে নটা,কিন্তু পরীক্ষার দরুন দেরী হয়ে গেল ।

ইস! সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে।চমকে উঠলাম মনে মনে। শীতের রাত ,তাই এগারোটার মধ্যেই নেমে এসেছে গভীর রাতের নিরবতা ।আশপাশের বাড়ি ঘরের আলো নিভে গিয়েছে।দোকানপাটও বন্ধ। এছাড়া রাস্তাতেও কোনো আলো জ্বলছে না সেরকম ভাবে। মুহূর্তটা যেন থমকে আছে কোন কিছুর প্রতীক্ষায়। রাস্তার লোক চলাচলও কমে গেছে একেবারে। দু একজন পথিক আর প্রাইভেট গাড়ি যারা পথে রয়েছে তখনও, তাদের চলার মধ্যেও গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া কোনো রুটের বাসও চোখে পড়ছে না। আপ ডাউন কোন দিকেই নয় । মনে হয়,চলছে না এখন।কোনো অটো টোটোর ও তো হদিস নেই । ঘড়ি দেখলাম,প্রায় দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি স্টপেজে।এখান থেকে বাড়ি প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার হাঁটা পথ। যা বুঝছি হেঁটেই ফিরতে হবে। কিন্তু মন চাইছিল না,যা দিনকাল পড়েছে এখন !এদিক ওদিক তাকিয়ে উসখুস করে উঠলাম।নাহ্! বাসের আশায় দেরি করা ঠিক হবে না ।হাটাই শুরু করি । রাস্তায় কোনো যানবাহন পেলে না হয় ধরে নেব।

চাঁদের আলোতে সবে দু-পা এগিয়েছি,হঠাৎ পিছনে কোন কিছুর খসখস শব্দ ঘুরে দাঁড়ালাম । আবছায়া দেখলাম এক মহিলা ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।পরনে কোনো হালকা রঙের গাউন।অত অন্ধকারে মহিলার বয়স অনুমান করতে না পারলেও বুঝলাম মহিলার বয়স হয়েছে। বৃদ্ধা কাঁপা কাঁপা গলায় ফিসফিস করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন- মাই বয়,এখানে কোনও লকেট পড়ে থাকতে দেখেছো রাস্তায়?'

অনুমান ঠিকই।তবে তিনি বিদেশিনী নন ।

এত রাতে বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তায় দেখে খুব আশ্চর্য হলাম।এর ওপর আরও আশ্চর্য হলাম বৃদ্ধার প্রশ্নে । ....কার লকেট ,কিসের লকেট এর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে তিনি ফের আগের মতোই চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন-'তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, রাস্তায় এই বাঁকটায়,তোমার আশেপাশে ,পায়ের কাছে কোনো লকেট পড়ে রয়েছে কি?দেখো তো মাই বয় একটু খুঁজে দেখো তো--? '

বৃদ্ধার অনুরোধে সেই অন্ধকারের মাঝেই ঝুকে ঝুকে দৃষ্টি চালিয়ে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করার পরে তাকে

জানালাম ,-'না ম্যাডাম,সেরকম তো কিছু নজরে পড়ছে না । আপনার বুঝি...,হারিয়ে গেছে?'

-'নাহ্! ওহো, নো নো মাই বয়,ওটা আমার নয়। আমার ছেলের।মাই ওনলি সন- টনি। টনির ওটা। ওর একুশ বছরের জন্মদিনে আমি ওকে একটা হার উপহার দিয়েছিলাম, লকেট টা তারই।ও সব সময় গলায় পড়ে থাকত ওটা। '

একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধার বুকের অন্তস্থল থেকে।বাতাসের বুকে তা কেমন এক শীতল শিহরণ জাগিয়ে ঢেউ খেলে গেল আমার চারপাশে। আমি নিস্পলক চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে ভেসে আমার কানে বেজে চলল তার ফিসফিসানি,-'জানো মাই বয়, আমার ওই একমাত্র ছেলে,মাই অনলি সন টনি, কথা শুনল না।মিলিটারিতে নাম লিখিয়ে চলে গেল। তখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলছে । এই ক্যালকাটা তেও বম্বিং শুরু হয়েছে।মাঝে মাঝে ওর চিঠি পেতাম। কখনো আফ্রিকার কোনো জায়গা থেকে,কখনো ইউরোপের কোনো শহর থেকে।কাটাকুটিতে ভরা, ওর ছোট্ট চিঠি অনেক আশা জড়িয়ে নিয়ে আসতো আমার কাছে । ওই বিশ্বজোড়া নরকের আগুনের মাঝেও, ও বেঁচে

আছে জেনে আমি খুব স্বস্তি পেতাম। ওর ঘরে ফেরার আশায় দিন গুনতাম বুক বেঁধে।

লাস্ট চিঠিটা এল মিলিটারি হাইকমান্ড অফিস থেকে।ওর গলার লকেট টা পাঠিয়ে আমায় জানালো, ও মারা গেছে! সব শেষ! সব শেষ!অল ফিনিশড্!' একটা ঝড়ো বাতাসের মতো হাহাকার তুলে বৃদ্ধা থামলেন। আমারে সর্ব শরীর শিউরে উঠলো।সভয়ে বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করলাম।এই অন্ধকারে শীতের রাতে,নির্জন রাস্তায় এ কার পাল্লায় পড়েছি আমি?কোন বিকৃত মস্তিষ্ক-টস্তিষ্ক কেউ নাকি!

কিন্তু কিছু বলার বা করার আগেই বৃদ্ধা পুনরায় বলতে শুরু করলেন -'মাই বয়, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি তুমি তখন এই পৃথিবীতে আসোনি এ সেই সময়ের কথা । তা একসময় মহাযুদ্ধ থেমে গেল একদিন।কিন্তু আমার ছেলের মত ক-ত ছেলে আর ফিরে এলো না তাদের বাবা-মায়ের কাছে। আমার মত ক-ত অভাগিনী মা ,তাদের হারানো ছেলের স্মৃতিটুকু শুধু আজীবন ধরে রাখল নিজের মনের গভীরে আপন করে। যেমন আমার কাছে থাকতো ওই লকেটটা,বুঝলে মাই বয়! শেষে আমারও একদিন শেষ হল সব।সব দুঃখ -শোক কাটিয়ে গেলাম প্রভু জোসেফের পায়ে

আশ্রয় নিতে। আর ওই লকেটটা, সেও ঠাঁই পেল আমার পার্থিব দেহের সঙ্গে মাটির নিচে।

কিন্তু কি জানো মাই বয়? পৃথিবীতে কোথাও-না-কোথাও কোনো না কোনোভাবে লড়াই চলছেই ....। অস্তিত্বের লড়াই ,আর ওতেই হেরে গিয়ে আমি আমার ছেলের শেষ সেই স্মৃতিচিহ্নটুকু কেও হারিয়ে ফেললাম।

ততদিনে আমার পার্থিব দেহ কফিনের কাঠের সাথে মিশে গেছে ধুলোয়-ডাস্ট-টু ডাস্ট! কটা জরাজীর্ণ হাড়ের টুকরোর সঙ্গে শুধু ওই পুরনো, স্মৃতি জড়ানো আমার ছেলের লকেটটা নিয়ে আমি শুয়ে আছি মাটির গভীরে।

কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে হঠাৎ একদিন গাইতি আর শাবলের আঘাতে আঘাতে আমি শিউরে উঠলাম।কিন্তু কি-বা করার আছে তখন আমার..।আমার দেহাবশেষ ওরা বেলচায় তুলে গাড়িতে করে উঠিয়ে নিয়ে গেল দূরে, অনেক দূরে...।

সেই সময়ই আমার ছেলের স্মৃতিচিহ্ন -আমার শেষ সম্বল, ওই লকেটটা এইখানেই কোথাও পড়ে গিয়েছিল । তা জানো, আমি আসি আমার ছেলের জন্মদিনের রাতে।আমি আসি সেই হারিয়ে যাওয়া লকেটের

খোঁজে,কিন্তু খুঁজে পাইনা ,কোথাও সেটাকে খুঁজে পাইনা।মাই বয়,এই নতুন রাস্তা টা আমার সেই কবর ভেঙেই তৈরি হয়েছে না!

আর তুমি ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো এখন, ওইখানেই ছিল আমার সেই কবরটা। দেখতো একটু খুঁজে লকেট টা এখানেই কোথাও পড়ে আছে,কিনা?

বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল,ঠিকই তো- বাবা,জ্যাঠা দের মুখে শুনেছি এই জায়গারই পাশে ছিল খ্রিস্টান বসতি । লোকে বলত সাহেবপাড়া। আর এইখানেই ছিল কবরস্থান । কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা।আমি হতভম্ব হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বৃদ্ধার কথাগুলি আমার কানে আসছিলো ঠিকই কিন্তু কেমন এক সম্মোহিতের মত আমার শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল।তাহলে আমার সামনে কে !সহসা এক অমানুষিক ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলাম।একটা ভয়ার্ত চিৎকারের শব্দ আমার গলা ভেদ করে বেরিয়ে এলো, 'আ.....!' আর সেই চিৎকারের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দেখলাম, বৃদ্ধার শরীর কুয়াশার মতো ভাসতে-ভাসতে এলোমেলো হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনার অপার্থিবতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম, যদি না ঠিক সময় এক টোটো এসে পড়তো সেখানে। টোটো থামিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল আমায়-' কি বাবু কি করছো? '

সম্বিত ফিরে পেলাম টোটো চালককে সামনে দেখে । ধীরে ধীরে মন থেকে ভয়টা কেটে যাচ্ছে। তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম-'তুমি কিছু দেখেছো,এখানে?'

সে অবাক হয়ে বললো-' না-তো! আমি শুধু দেখলাম একা একা সামনের দিকে চেয়ে তুমি কি সব বিড়বিড় করছো ।তা তুমি কিছু দেখেছ নাকি?জায়গাটা ভালো নয়। কৌতুহলী হয়ে উঠল টোটো চালক।

তার কৌতূহল মেটাতে তার কাছে আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলাম না শুধু বললাম -'না-না,কিছু না, তা আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে তুমি?'

রাজি হল সে ।টোটোতে উঠে বসলাম।টোটো এগিয়ে চলল কুয়াশার ঘেরাটোপে ঢাকা শীতার্ত রাতের নির্জন রাজপথ মাড়িয়ে আমার বাড়ির দিকে।

চলন্ত টোটোয় বসে শীতল বাতাসের স্পর্শে শরীরের সজীবতা ফিরে পাচ্ছি ধীরে ধীরে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম।চোখে পড়ল আবছাভাবে বৃদ্ধার সেই কবরস্থানের জায়গাটি এখন যা বাস স্টপেজ হয়েছে।

ধীরে ধীরে কুয়াশার অন্ধকারে তা মিলিয়ে যাচ্ছে।
তখনই বুকের কাছটা মোচড় দিয়ে উঠল।অনুভব করলাম একজন মা কতটা স্নেহময়ী হতে পারে নিজের সন্তানের জন্য...।
সেই মুহূর্তে মনে হল যেন কানের কাছে যেন শুনতে পেলাম,-'এক চিরন্তনী মাতৃত্বের আকুল আর্তি...
মাই বয় দেখতো একটু খুঁজে লকেট টা এখানেই কোথাও পড়ে আছে কি-না?

কবরবন্দি ইতিহাস
পৌলমী গাঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব-১

দিনের বেলাগুলো সুন্দর মনে হলেও রাতগুলোকে খুব ভয় পায় জুবেদা। সারাদিনটা একরকম ভালো কাটলেও কালো জটাধারী দস্যুর মত রাতগুলো এলেই শিউরে ওঠে সে! ভয়! এক অজানা ভয়! রাত যদি বিনিদ্র কাটানো যেতো তাহলে হয়তো এই অজানা ভয়ের থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসা যেত! কিন্তু প্রতিটা রাত কি বিনিদ্র কাটানো সম্ভব? না! সম্ভব নয়! কিন্তু দু চোখের পাতা এক করলেই যে সেই একই স্বপ্ন! বারবার, প্রতিবার! কেন আসে এইরকম স্বপ্ন তার? সে জানেনা! সে চেনেনা সেই স্বপ্নের স্থান, কাল, পাত্রগুলোকে! কোনদিন সেই জায়গা সে দেখেনি আজ পর্যন্ত! সেই মানুষগুলোকেও সে চেনেনা! কিন্তু শিউরে ওঠে সে প্রত্যেকবার স্বপ্নের শেষ পরিণতিটা দেখে! চোখ খুলতে চায় কিন্তু পারেনা খুলতে! কোন এক অজানা শক্তি যেন প্রত্যেকবার তাকে শেষটা না দেখা পর্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে গেলেও চোখ খুলতে দেয়না! এ এক

বিনিদ্র রাতের চেয়েও ভয়ংকর নিদ্রা যেন! এর কি কোন অন্ত নেই তবে?

জুবেদা, জুবেদা সুলতানা শ্রীনগরে থাকে তার আব্বু মুজিব রহমান, আম্মি সায়েদা বেগম আর ছোট ভাই রেহানের সাথে। মুজিবের নিজস্ব দুটি শিকারা আছে যেগুলো থেকে পর্যটকদের আসার সিজনে বেশ ভালই রোজগার হয়! তাছাড়া কাশ্মীরি শাল, সোয়েটার এসবের একটা ছোট্ট দোকানও ভাড়া নেওয়া আছে তার আর তারই সঙ্গে নিজেদের দোতালা বাড়িটার নিচের তলাটা পুরোটাই লজ করে রেখেছে পর্যটকদের জন্য! সবমিলিয়ে বেশ স্বচ্ছল অবস্থা জুবেদাদের। জুবেদার আম্মি লজটার দেখাশোনা করেন আর ওর আব্বু বাইরের কাজগুলো দেখেন, বেশ সুন্দর বোঝাপড়া দুই মিয়াঁ বিবির! জুবেদা এখন ক্লাস নাইনে উঠেছে! ভাই রেহান ক্লাস ফোরে পড়ে। ওরা দুজনেই সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করে! জুবেদা ছোট থেকেই বেশ নম্র ভদ্র, শান্ত স্বভাবের মেয়ে! কাশ্মীরি মেয়ে হলেও জুবেদাকে যে কেউ চিনা মেয়ে ভেবে ভুল করতেই পারে! ফর্সা, চ্যাপটা নাক, চোখদুটো একটু ছোট ছোট! সবমিলিয়ে তাকে চিনা মেয়েদের সাথে

গুলিয়ে ফেললে সেটা কারুর ভুল বলে বিবেচ্য হবেনা! জুবেদা সকালে উঠে আম্মিকে নাস্তা বানাতে সাহায্য করে। তারপর স্নান করে, খেয়ে দেয়ে, টিফিন নিয়ে ভাই রেহানের সাথে সকাল ৮টার মধ্যে স্কুলে চলে যায়। ওরা স্কুলে চলে যাওয়ার পর সায়েদা বেগম হাতের কাজগুলো মিটিয়ে মুজিবকে খেতে দিয়ে দেয় আর নিজেও দুটো খেয়ে নিয়ে লজের তদারকি করতে লেগে পড়ে! মুজিব সকাল ১০টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ে দোকান খুলতে! লজটা সবসময় দেখাশোনা করা, গেস্টদের খাবার, জল দিয়ে আসা, এসবের জন্য একটা ছেলেকে রেখেছে তারা! ছেলেটা সায়েদার দূর সম্পর্কের লতায় পাতায় এক ভাই হয়, নাম রামিজ। যদিও সম্পর্কে ভাই কিন্তু বয়সের দিক থেকে রামিজ অনেকটাই ছোট সায়েদার থেকে! পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে রামিজ সায়েদা আপার কথামত সব কাজ একা হাতে সামলে দেয়! সায়েদা লজের সামনের ছোট্ট রিসেপসনটাতে বসে গেস্টদের রিসিভ করে আর বাকি জিনিসগুলোও তদারকি করে একই সাথে! যখন কাজ হালকা থাকে তখন বাড়ি তথা লজের সামনের ছোট্ট বাগানটাতে গিয়ে বসে সায়েদা! রামিজ বাহারি ফুল, বিভিন্ন রঙের গোলাপ লাগিয়েছে সেখানে! রোজ

নিয়ম করে জল দেয় সে! শীতের আগে আগে গোলাপের গন্ধে চারপাশটা ম ম করতে থাকে! এবার রামিজকে বলেছে যে বসন্ত আসার আগে কিছু রঙ বেরঙের টিউলিপের চারা এনে লাগাতে এখানে! পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই টিউলিপ! তাই লজের বাগানে এক দুটো টিউলিপ উঁকি দিলে সেটা তাদের ব্যবসার জন্য লাভজনকই হবে বলে মনে করে সায়েদা বেগম। মার্চ থেকে মে মাসটা হল পর্যটকদের আসার সবচেয়ে সুবর্ণ সময়! এমনিতে সারা বছরই টুকটাক করে লোকজন ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ভূস্বর্গে আসতেই থাকে! কিন্তু এই তিনমাস সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে! জুবেদাদের বাড়ির নিচের তলার লজটা খুব বড় না হলেও বেশ সুন্দর আর ছিমছাম! সর্বমোট ৬টা ঘর আছে নিচের তলায়! সাইডে একটু বাড়ানো হয়েছে আরও তিনটে সিঙ্গেল বেড রুম করার জন্য! এই বাড়তি রুমগুলো সিজনে খুব কাজে আসে! সর্বমোট ৬টা ডাবল বেডেড আর ৩টে সিঙ্গেল বেডেড রুম গেস্টদের জন্য সবসময় তৈরি রাখা হয়! কোন কোন গেস্ট আবার ডাল লেকের উপর ভাসমান হাউসবোট গুলোতে থাকতে বেশি উৎসাহী থাকে! তাই

খাওয়ারেরও একটা ব্যবস্থা করেছে সায়েদা আর মুজিব মিলে! যারা লজে থাকছে তাদের জন্য তো তিনবেলার খাওয়ার থাকেই এমনকি যারা শুধু খাওয়ার প্যাক করে নিয়ে যেতে চায় তাদের জন্যও এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে! জুবেদাদের বাড়ি তথা লজটা একদম ডাল লেকের ধারেই! তার উপর রান্নার দিকটা সায়েদা নিজের হাতে সামলায়, কাজের মেয়ে রাবেয়া যদিও সাহায্য করে দেয় তাকে! তাই সায়েদার তৈরি খাবারে একটা ঘরোয়া ছোঁয়া থেকেই যায়, আর অনেক বেশি সুস্বাদুও হয়! তাই অনেক হোটেল থাকা সত্ত্বেও বহু পর্যটক এক ওর থেকে জানতে পেরে জুবেদাদের থেকেই খাওয়ার প্যাক করিয়ে নিয়ে যায়!

রাবেয়া সকালে আসে, তারপর সব রুমগুলো ঝাঁট দিয়ে, মুছে পরিষ্কার করে সামনের দালানটা জল দিয়ে ধুয়ে দেয়! তা করতে সায়েদা জুবেদার সাথে সকালের নাস্তাটা বানিয়ে ফেলে আর তারপর জুবেদা, রেহান আর শেষে মুজিব বেরিয়ে গেলে রাবেয়া আর রামিজকে দুটো নাস্তা দেয়। তারপর রাবেয়া রান্নার যোগার করতে চলে যায় আর সায়েদা কিছুক্ষণ রিসেপসনে এসে বসে। রামিজ সেই সময়টা সব রুমে জল দিয়ে আসে, আর

বাগানের গাছগুলোতে জল দিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ রিসেপসনে থেকে সায়েদা রান্নাঘরে চলে যায় দুপুরের খাওয়ার তৈরি করতে! তখন রিসেপসনে রামিজ থাকে। রাবেয়া আর সায়েদা মিলে সব রান্নাবান্না শেষ করে খাওয়ার গুলো সাজিয়ে দেয় আর রামিজ গেস্টদের রুমে সেইগুলো পৌঁছে দিয়ে আসে! এক একজন গেস্টের এক একরকম ফরমান থাকে! সব করে উঠতে উঠতে প্রায় দুপুর ৩টে বেজে যায়! রাবেয়া কোন কোন দিন বসে খেয়ে নেয় ৩টের পর, আবার যেদিন তাড়া থাকে সেদিন কাজ মিটিয়ে খাওয়ার নিয়ে চলে যায় ৩:৩০-৪:০০ এর মধ্যে! সায়েদা চটজলদি রামিজকে খেতে দিয়ে নিজের খাওয়াটা সেরে নেয়! মুজিব দুপুরে খেতে আসেনা! খাওয়ার যা নিয়ে যায় তাই খেয়ে নেয়! কারণ সিজনে দোকান দুপুরে বন্ধ রাখাটাও ক্ষতিরই সমান! যদিও যখন অফ সিজন চলে তখন এত চাপ সায়েদা কিম্বা মুজিব কারুরই থাকেনা! তখন মুজিব মাঝে মধ্যে দুপুরে খেতে চলে আসে! কিন্তু সিজনে দম ফেলার সময় থাকেনা। সারা বছর এই মাস তিন-চারেকের জন্যই তো তারা অপেক্ষা করে থাকে! এই সময়টাতে যত খাটতে পারবে, শীতের মরসুমে ততই আরামে কাটাতে পারবে! জুবেদা আর রেহান ৪টের

দিকে স্কুল থেকে ফেরে। দুই ভাইবোনকে দুটো খেতে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে সায়েদা! এরই মধ্যে সন্ধ্যে হতে হতেই আবার খাওয়ারের দিকটা দেখতে হয়! রাতে রাবেয়া থাকেনা। তাই রাতের রান্নার দিকটা সায়েদা আর জুবেদা মিলেই সামলায়! রান্নাবান্না শেষ হলে রামিজ খাওয়ারগুলো গেস্টদের রুমে রুমে দিয়ে আসে। সায়েদা তখন একটু আবার রিসেপসনে এসে বসতে পারে! জুবেদা উপরে নিজেদের ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করে আর ভাইকেও পড়তে সাহায্য করে! এই করতে করতেই রাত প্রায় ৯:৩০-১০:০০ বাজলে মুজিব ফিরে আসে। লজটা রামিজের ভরসায় রেখে সায়েদা উপরের ঘরে উঠে আসে! তারপর চারজনে মিলে খেতে বসে! সারাদিনের যাবতীয় গল্প এইসময় চারজন চারজনের সাথে ভাগ করে নেয়! এই সময়টা সায়েদার সবচেয়ে প্রিয় সময়! সারাদিনের সব ক্লান্তি এইসময় যেন ধুয়ে মুছে যায় তার! খাওয়া শেষ হলে রামিজকে খেতে ডাকে সায়েদা। আর নিজে গিয়ে লজের রিসেপসনে বসে! যখন অফ সিজন চলে তখন রামিজও তাদের সাথেই রাতের খাওয়ারটা খেতে পারে! রামিজ অনাথ! মামার কাছে মানুষ হয়েছে সে! কিন্তু ১৮ বছর বয়স হতেই মামা তাকে তাড়িয়ে দেয় নিজের দিক

নিজেকে দেখে নিতে বলে! খুড়তুতো এক বোনের মারফত এসব জানতে পারে সায়েদা! তখন সে রামিজকে নিজের কাছে এনে রাখে! এমনিতেও লজটা তখন সবে সবে শুরু হয়েছে তাদের! কারণ আগে জুবেদাদের একতলা বাড়ি ছিল! পরে টাকা জমিয়ে জমিয়ে দোতালা তোলা হয়! উদ্দেশ্য ছিল নীচটাকে লজ বানানোর।অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছিল! তাই একজন নিজের লোক কাছে থাকলে অনেক সাহায্য হয়! সেইভেবে রামিজকে নিজের কাছে এনে রাখে সায়েদা! মুজিবও আপত্তি করেনি এতে! সেই থেকে আজ প্রায় ৭ বছর হতে চলল রামিজ এখানে আছে, আর খুব ভালো আছে! সায়েদা আপা আর মুজিব মিয়াঁ তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন আর সেও চেষ্টা করে যথাসাধ্য তাদের খুশি রাখার! প্রথমে ৪টে রুম নিয়ে শুরু হয়েছিল এই "জান্নাত লজ"। এখন তা ৯টা রুমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার সাথে সাথে অনেক পরিচিতিও বেড়েছে! খাওয়ারের ব্যবস্থাটা আগে ছিলনা! গত ৩ বছর ধরে খাওয়ারের ব্যবস্থাটা যুক্ত হওয়ায় ব্যবসাতে আরও উন্নতি হয়েছে তাদের! এই ব্যবসার দৌলতে মুজিব নিজের শাল সোয়েটারের ছোট্ট দোকানটাও সুন্দর করে সাজাতে পেরেছে, আগে একটা শিকারা

ছিল, এখন দুটো শিকারা ভাড়ায় খাটায় সে!
সায়েদার মাঝে মাঝে নিজের ছোটবেলাটা মনে পড়ে যায়! তার আব্বুর নিজের একটা শিকারাও ছিলনা। মালিকের শিকারা চালিয়ে যা আয় হত তার বেশিরভাগটাই মালিকের পকেটেই চলে যেত। আর সায়েদার আম্মি ভালো সেলাই করতেন। কিন্তু সেসব করেও সায়েদা সহ আরও চার ভাইবোনের পেট আধা দিন ভরত না! সায়েদা সবচেয়ে বড় সন্তান ছিল তার আব্বু আম্মির! তাতে আবার মেয়ে! তাই স্কুলের গণ্ডি কোনোদিন পার করা হয়নি তার! ক্লাস ৬ অব্দি পড়াশুনা করে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল ঘরের কাজে আম্মিকে সাহায্য করার জন্য! তারপর ১৫ বছর হতে না হতেই মুজিবের সাথে তার নিকাহ হয়ে যায়! মুজিবও সায়েদার আব্বুর মতই শিকারা চালাত! কিন্তু তার নিজের শিকারা ছিল সেটা। অবস্থা কিছুটা হলেও ভাল ছিল সায়েদাদের থেকে! নিকাহর পর সায়েদা আর মুজিব মিলে বুঝতে পারে যে দিন যত এগোচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যয়ও বাড়ছে! সায়েদা অল্প শিক্ষিত হলেও বুদ্ধিমান ছিল! বিয়ের এক বছরের মাথায় জুবেদার জন্ম হতেই সে মুজিবকে শিকারার সাথে সাথে আরও কিছু ব্যবসা খোলার জন্য বোঝায়! মুজিব

সায়েদার কথার গুরুত্ব বুঝতে পেরে একটা ছোট্ট দোকান ভাড়া নেয় শাল বিক্রির উদ্দেশ্যে! আস্তে আস্তে দোকান চলতে শুরু করে! সায়েদা নিজের আম্মির কাছ থেকে বোনাবুনি ভাল মতই শিখেছিল! বাচ্চা সামলে রাত জেগে সে শাল, সোয়েটার বুনে দিত! হাতে বোনা জিনিসের কদর সবসময়ই বেশি! তাই সিজনে সেইসব জিনিস খুব করে বিক্রি হতে লাগলো। শিকারাটা ততদিনে ভাড়া খাটাতে শুরু করেছে মুজিব! এইভাবে আস্তে আস্তে তাদের অবস্থা ভাল হতে লাগলো। তারপর লজ খোলার কথাটা তাদের মাথায় আসে! এরই মাঝে রেহানের জন্ম হয়! আর আস্তে আস্তে আজ নিজেদের ব্যবসাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে তারা! জুবেদা আর রেহানকে অনেক দূর পড়াশুনা করানোর ইচ্ছা সায়েদা আর মুজিব দুজনেরই! তাই দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে তারা! জুবেদাও আম্মিকে সাধ্যমত সাহায্য করে! সব মিলিয়ে এক সুখী পরিবার! কিন্তু এরই মাঝে শুধু একটা জিনিস জুবেদাকে শান্তি দেয়না! সেটা হল এই রাতগুলো! ছোট থেকেই রাতে ঘুমোতে গেলেই কিছু অস্পষ্ট স্বপ্ন ভিড় করে আসতো তার চোখে! কিন্তু দিন যত এগোতে লাগলো তত সেগুলো যেন বেশি করে স্পষ্ট হতে শুরু করলো! এখন তো

শুরুটা অস্পষ্ট মনে হলেও শেষটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পায় সে! কেউ কাতরাচ্ছে! বুক ফালাফালা করে কিছু একটা গেঁথে রয়েছে তার! কিন্তু চোখে তার আগুন! মুখটা স্পষ্ট না হলেও সেই বীভৎস দৃষ্টিতে সে যেন জুবেদার দিকেই তাকিয়ে থাকে প্রত্যেকবার! যেন সেই ক্রোধের আগুনে সে জ্বালিয়ে দেবে জুবেদাকে! জুবেদা সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনা! সে চোখ খুলতে চায়! কিন্তু পারেনা! মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ার আগে কিছু একটা সে বলে! কিন্তু তা খুবই ক্ষীণ! জুবেদা শুনতে পায়না! আর ঠিক তখনই তার চোখ খুলে যায় অজান্তেই! বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে সে! আম্মিকে বলেছে অনেকবার! আম্মি বলে অতি পরিশ্রমে এরকম হতে পারে! আল্লাকে স্মরণ করে কোরান শরিফ মাথার কাছে রেখে ঘুমাতে! জুবেদাও তাই করেছে! কিন্তু কই, এই জিনিস তো থামার নামই নিচ্ছে না! বরং ধূসর কুয়াশার চাদর একটু একটু করে সরে যেন কিছুর একটা ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে জুবেদাকে! এখন রীতিমত ভয় হয় জুবেদার রাত হলেই! এমন কি কোন রাত আসবে কখনো যে রাতে জুবেদা শান্তিতে ঘুমোতে পারবে? একি নিছকই স্বপ্ন নাকি অন্য কিছু? জুবেদা জানেনা এর উত্তর! কেউ কি তবে জানে?

“আপা, যুদ্ধ কেন হয়?” বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রেহান হটাত জিজ্ঞেস করে উঠলো। “প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের স্বভাব হল সবকিছুকে ছিনে, তাকে জয়ের নাম দিয়ে নিজেকে আল্লার সমান দেখানো! আর এই জয়ের নামে খুনোখুনি করাকেই যুদ্ধ বলে! তা, হটাত এই প্রশ্ন কেন?” বলে তাকাল জুবেদা রেহানের দিকে। “তাহলে কি কাশ্মীরকে জয় করতেই এত যুদ্ধ হয়ে চলেছে আপা?” জুবেদা রেহানের প্রশ্নে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল “হ্যাঁ! কিছুটা তাই! তবে এসব কথা এখানে তুই জোরে জোরে বলিস না রেহান!...” জুবেদার কথা শেষ হওয়ার আগেই রেহান আবার বলতে চেষ্টা করে “কিন্তু আপা...” “ব্যস! আর এই বিষয়ে কোন কথা নয়! যা কথা সব বাড়ি পৌঁছে হবে!” জুবেদার কথায় তখনকার মত চুপ করে যায় রেহান। জুবেদা রেহানের হাতটা শক্ত করে ধরে জোরে জোরে বাড়ির পথে পা চালায়।

“আরে রুবেল ভাইজান যে! সালাম ওয়ালেকুম!” বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে জুবেদা সামনের বাগানে বসে

থাকা বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক যুবককে বলে উঠলো। "ওয়ালেকুম আসালাম! কেমন আছো তোমরা? রেহান কি খবর?" এক গাল হেসে বলে উঠলো রুবেল। "আমি ভাল ছিলাম না এতক্ষণ ভাইজান! আপা আমাকে বকছিল এতক্ষণ! কিন্তু তোমার দেখা পেয়ে আমি একদম ভাল হয়ে গেছি! আমার এত্ত প্রশ্ন জমে আছে মনে ভাইজান! আমি জানি তুমি সেসব উত্তর দেবেই!" বলে প্রায় লাফাতে লাফাতে এক ছুটে রেহান ঘরের মধ্যে ঢুকে স্কুল ব্যাগটা রেখেই আবার ফিরে এল। "রেহান! ভাইজান কোথাও পালিয়ে যাবেনা! চল এখন আম্মি আমাদের জন্য উপরে ইন্তেজার করছে! খাওয়ারটা খেয়ে তারপর আবার আসবি!" জুবেদার কথার রেশ টেনে রুবেল বলল "জুবেদা ঠিক বলছে রেহান! যাও জামাকাপড় পালটে কিছু খেয়ে নিয়ে এসো! আমি এখানেই আছি!" রেহান অনিচ্ছা সত্বেও সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। জুবেদা সেইদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল "তা ভাইজান, প্রায় ২ বছর পর এলে! সব খেইরিয়েত তো?" রুবেল হালকা হেসে বলল "হ্যাঁ সব ভাল!" "ঠিক আছে ভাইজান! আমিও খেয়ে নিয়ে আসছি! কথা হবে আবার! সালাম!" জুবেদার কথায় রুবেল মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

“লেখকদের কি আর কোন স্থায়ী ঠিকানা হয় বল! ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয় নতুন প্লটের খোঁজে! আবার এক জায়গায় দশবারও যেতে হতে পারে সেখানকার অজানা কিছু কথা যদি অসম্পূর্ণ রয়ে যায় জানতে!” বলে রুবেল কফির কাপে চুমুক দিল। জুবেদা চুপ করে রইল। “কিন্তু ভাইজান যুদ্ধ কেন হয় বললে না তো!” রেহান অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো। রুবেল একটু হেসে বলল “যুদ্ধ হয় মানুষের লোভের জন্য! বলতে পারো মানুষের লোভ যখন মানুষের সকল চিন্তা ভাবনাকে অতিক্রম করে যায় তখনই তা এক প্রলয়ের রূপ নেয়, যাকে আমরা যুদ্ধ বলি!” রেহান হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে কিছুটা বুঝল, কিছুটা বুঝল না! “লোভ কি জিনিস ভাইজান?” রেহানের প্রশ্ন শেষ হতেই জুবেদা বলে উঠলো “রেহান! তোর সওয়াল কোনদিনও শেষ হওয়ার নয়! কি যে যুদ্ধ যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে সেই তখন থেকে!” রেহান মুখটা কালো করে বলল “আপা! তোমাকে তো আর জিজ্ঞেস করছিনা! ভাইজানকে করছি! তুমি কেন বকছ তাও?” “দেখেছো ভাইজান! বড় আপার সাথে কিভাবে কথা বলছে?” জুবেদা আর রেহানের ঝগড়া লেগে গেল। রুবেল কাউকেই বুঝিয়ে পাচ্ছেনা! এই করতে সায়েদা এল। “জুবি, রেহু কি

হচ্ছে এসব? রুবেল কতদিন পর এসেছে! আমাদের লজের মেহেমান! তার সামনে এগুলো কি?" বলে হালকা ধমক দিল সায়েদা জুবেদা আর রেহান দুজনকেই! "আঃ খালা! কেন বকছেন ওদের! আমার কিছু খারাপ লাগেনি!" বলে একগাল হাসল রুবেল। "জুবেদা, রেহান যাও একটু আরাম করে নাও! তারপর আবার রাতের রান্না করার আছে!" বলে সায়েদা রুবেলের সামনের চেয়ারে এসে বসলো। জুবেদা রেহানকে নিয়ে রুবেলকে সালাম জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এখন অক্টোবর মাস চলছে! শীত এসে গেছে তাই লজে তেমন ভিড় নেই! এই সময়টাতে সায়েদার একটু হাত ফাঁকাই থাকে বলতে গেলে! "তা মিয়াঁ! কাহানি লেখা কতটা এগোলো?" সায়েদা হেসে জিজ্ঞেস করলো। রুবেল কিছুটা বিষন্ন হেসে বলল "চলছে আর কি! এই নিয়ে চারবার এলাম কাশ্মীরে! প্রতিবারই আপনাদের এখানেই এসে থাকি! প্রতিবারই একটা কিছু নতুন খুঁজে চলি! কিন্তু পাইনা! কেন পাইনা জানিনা! আসলে কি জানেন তো খালা, এখন অনেকেই লেখালিখি করেন। কেউ সখে কেউ আবার প্রয়োজনে! কিন্তু আমি করি এক তীব্র আকর্ষণে! আমি এমন কিছু একটা লিখতে চাই যেটা পড়ে মানুষ হতভম্ব হয়ে যাবে!

ভাববে যে এমনও কি হয়? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু সৃষ্টি করে উঠতে পারিনি!" সায়েদা স্মিত হাসে। লেখালিখির ব্যাপারে সায়েদা সেরকম কিছুই বোঝেনা বলতে গেলে! তবে এই রুবেলকে প্রায় বিগত ৫ বছর ধরে দেখছে সায়েদা! এই ৫ বছরে চারবার মত এখানে এসেছে রুবেল। যখনই আসে, শীতের শুরুতে কিম্বা শীতকাল চলাকালীনই আসে সে! কারণ সে লেখার কাজেই আসে প্রতিবার আর অন্যসময় মানে সিজনের সময় আসলে অনেক ভিড় থাকে লজে! বেশি কোলাহল হলে মনোযোগ করতে অনেক অসুবিধা হয় তাই রুবেল শীতকালটা শুরু হলে তবেই আসে। "তা এবার কদিন থাকছ?" সায়েদার প্রশ্নের জবাবে রুবেল বলল "ঠিক নেই! দেখা যাক! এমনিও আমার মনে হয় এই শীতকালে কাশ্মীরের এক অন্যরূপ ফুটে ওঠে! শান্ত, নিরিবিলি অথচ এক অমোঘ আকর্ষণ তৈরি হয় এই সময়টাতে! এবার একরকম দৃঢ়ভাবেই চেষ্টা করছি সেরকম কিছু লেখার! কাল থেকেই লেখা শুরু করবো! সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরবো আর রাতে এসে লিখব!" বলে হাসে রুবেল। সায়েদাও হাসে তারপর বলে "আগের তিনবারেও সবটা ঘোরা হয়নি মিয়াঁ?" রুবেল বলে "খালা, একই

জায়গাকে বারবার, প্রতিবার যদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন অনেক কিছু নতুন জিনিস সেই একই জায়গায় খুঁজে পাবেন! আমি অনেকবারই এখানে এসেছি, ঘুরেছি ঠিকই, কিন্তু তাও সেই জিনিসটা খুঁজে পাইনি যা আমার উপন্যাসটাকে এক অন্যমাত্রা এনে দেবে!" "কাশ্মীরেই পাবে সেই জিনিস তার কি নিশ্চয়তা?" সায়েদা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো। রুবেল কফির কাপটা সামনের ছোট্ট টেবিলটাতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল "না! তার কোন নিশ্চয়তা নেই! কিন্তু কি জানেন তো, আমি এই জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেছি, বাকিরা তো এই কাশ্মীরের প্রেমেই পড়ে কেবল!" "আর তাও যদি এখান থেকে কিছু লাভ না হয় তো?" সায়েদার কথায় রুবেল বলে "তাহলে আর কি! আরও উপরের দিকে যেতে হবে! গুলমার্গ, সোনমার্গ কিম্বা হয়তো লে! কোথাও তো আমার গল্পের ক্লাইম্যাক্সটা পাবোই খুঁজে! গুড থিংস টেক টাইম!" "এই রে! শীতকালে কখন যে ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে আসে বোঝাই যায়না! ঠাণ্ডা বেশ বাড়ছে! তুমি ভিতরে চলে যাও মিয়াঁ! রাতে কি খাবে? মুরগির ঝোল আর রুমালি রোটি চলবে?" সায়েদার কথার মাঝেই উঠে পড়ে রুবেল। তারপর বলে "চলবে

কি খালা! বলুন ছুটবে!" সায়েদা মাথা নাড়িয়ে বলে "ঠিক আছে! তুমি আর আরেকজন গেস্ট আছেন! রামিজকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করিয়ে নেব যে সে আর কিছু খেতে চায় কিনা! আর তুমি এখন রুমেই যাচ্ছ তো? কফি বা হট চকলেট কিছু পাঠিয়ে দেব কি রামিজকে দিয়ে?" "হ্যাঁ এখন রুমেই যাব! আজকে বেশ লম্বা সফর ছিল! সেই দিল্লি থেকে সরাসরি এখানে এলাম! আর একটু ব্ল্যাক কফি পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয়না এই শীতের সন্ধ্যেবেলায়!" বলে অমলিন হাসল রুবেল। সায়েদা একমুখ হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে রামিজকে ডাকতে লজের রিসেপ্সনের দিকে এগিয়ে গেল।

মাঝরাতে হটাত করে একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল রুবেলের। চিৎকারটা উপর তলা থেকে এল বলেই মনে হল। শীতের রাত, তাই চারদিক একটু বেশিই নিস্তব্ধ। ফোনের আলোটা জ্বালিয়ে টাইমটা দেখার চেষ্টা করলো রুবেল। দেখল ৩:৪৫ বাজে! ভুল শুনেছে ভেবে শুতে যাচ্ছিলোই তখন মনে হল যে গলাটা শুকিয়ে গেছে! গায়ের ব্ল্যাঙ্কেটটা সরিয়ে রুমের লাইটটা জ্বালাল রুবেল। রুমে নাইট ল্যাম্প আছে

যদিও কিন্তু রুবেল ঘর অন্ধকার করে শুতেই অভ্যস্ত! লাইটটা জ্বালাতে দেখল জগে জল শেষ।“রামিজ কি জল ভরে দিয়ে যায়নি?” নিজের মনেই প্রশ্ন করে উঠলো সে। তারপর হটাতই মনে পড়লো যে রামিজ জলভর্তি জগটা দেওয়ার জন্য এসে তো ছিল কিন্তু তখন সে ওয়াশরুমে ছিল তাই দরজা খুলতে পারেনি! পরে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে ভেবেছিল!কিন্তু পরে ভুলেই গেছিল আনতে! কি আর করা যাবে! গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, চটিটা পায়ে গলিয়ে রুম থেকে জগ সমেত বেরিয়ে এল রুবেল। করিডরটাতে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে! পর পর রুমগুলো সব বন্ধ!” আরেকজন যে আছে সে কোন রুমে আছে কি জানি!” মনে মনে ভাবল রুবেল। যাই হোক রিসেপ্সনে এসে কোণার ওয়াটার ফিল্টারটার দিকে এগিয়ে যায় রুবেল। জল ভরতে ভরতে হটাতই মনে হয় কেউ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে! আওয়াজটা উপরের তলা থেকেই আসছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে! আর কান্নাটা কোন মেয়ের কান্নাই মনে হচ্ছে, সাথে ফিসফিস করে কথা বলারও আওয়াজ আসছে! তবে কি সায়েদা খালা কিম্বা জুবেদার কিছু হয়েছে? জল ভরা শেষে রুবেল এসবই ভাবতে থাকে! তারপর কি মনে হতে সিঁড়িটার দিকে

এগিয়ে যায়। সিঁড়ির তলা থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা রুমের দরজার তলা দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছে! রুবেল সায়েদা খালাদের উপরের ঘরগুলোতে কোনদিন যায়নি! বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার আওয়াজ আসে! রুবেল সিঁড়ির রেলিঙের সাইডে লুকিয়ে যায়! দেখে সায়েদা আর মুজিব আলো জ্বলা রুমটা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রুমের আলোও নিবে গেল। সায়েদা আর মুজিব কিছু ফিসফিস করে কথা বলছিল, কথাগুলো শুনতে না পেলেও তারা যে বেশ চিন্তান্বিত সেটা কিছুটা বুঝতে পারছিল রুবেল। কিছুক্ষণ কথা বলে দুজন পাশের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। রুবেল এবার সিঁড়ির রেলিঙের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে জলের জগটা নিয়ে নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

“কি রেহান মিয়াঁ! আজকে একা একাই স্কুলে যাচ্ছ! আপা কই?” রুবেল নিজের রুম থেকে বেরচ্ছিল তখনই রেহানকে স্কুলে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করে ওঠে। “না ভাইজান! আপার না খুব জ্বর! ঐ কাল রাতে...”রেহানের কথা শেষের আগেই মুজিব এসে পড়ে সেখানে আর বলে ওঠে “হ্যাঁ, আসলে কাল রাত

থেকেই জুবেদার খুব জ্বর! মওসম বদল হচ্ছে না! তাই জন্য! আমি যাচ্ছি রেহানকে স্কুলে ছেড়ে আসতে! এখন তো দোকানে কাজের চাপ কম! দেরি করে যাবো!" বলে একগাল হাসে মুজিব। তারপর বলে "নাস্তা হয়েছে মিয়াঁ?" রুবেল হেসে বলে "না জনাব! হবে! রামিজকে সামনের বাগিচায় নাস্তা নিয়ে আসতে বললাম! শীতের সকালটা উপভোগ করতে চাই!" "বেশ বেশ! আমি মিয়াঁ রেহানকে স্কুলে ছেড়ে আসি তবে! আল্লা হাফিজ!" মুজিবের কথার প্রত্যুত্তরে রুবেলও তাকে বিদায় জানায়।

রুবেলের মনে একটা খটকা লাগে! তবে রাতের চিৎকারটা কি জুবেদার ছিল? এর আগেও যখন এসেছিল এক আধবার শুনেছিল রাতে এরকম চিৎকার! কিন্তু কালকেরটা যেন একটু বেশিই জোরালো ছিল! জুবেদার কি কিছু অসুবিধা আছে তবে! পরোটার কামড় দিতে দিতে ভাবছিল রুবেল। তারপর লজটার দিকে তাকায় সে! কি মনে হতে নাস্তাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে লজের ভিতরে ঢোকে সে! ভিতরে ঢুকতেই সায়েদার সাথে দেখা! একমুখ স্বভাবসিদ্ধ হাসি খেলিয়ে সে বলে "কি মিয়াঁ, নাস্তা হল?" আজকে কেন জানিনা সায়েদার হাসিটা বেশ বিষন্ন মনে হল রুবেলের। রুবেল একটু

আস্তে করে বলল “জুবেদার জ্বর কমেছে খালা?”
সায়েদা মুহূর্তেই একটু গম্ভীর হয়ে বলল “হ্যাঁ না মানে কিছুটা ভালো আছে!” রুবেল এবার বেশ সাহস নিয়ে বলল “যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি কি একবার জুবেদাকে দেখে আসতে পারি? ভাইজান ভাইজান বলে ডাকে আমাকে! তাই আর কি!” সায়েদার মুখটা একটু কালো দেখাল। তারপর আমতা আমতা করে বলল “ঠিক আছে মিয়াঁ! চল!”
সায়েদা রুবেলকে নিয়ে উপরের ঘরে উঠে এল। এই প্রথম রুবেল সায়েদাদের উপরের ঘরগুলো দেখল। মাঝের ঘরটাতে এসে দুজনে ঢুকল। রুবেলের মনে পড়লো যে কাল রাতে এই ঘরটা থেকেই আলো বেরিয়ে আসছিল! এসব ভাবতে ভাবতেই রুমে ঢুকে দেখল জুবেদা একটা মোটা ঢাকা গায়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে! “মনে হয় ঘুমোচ্ছে! থাক আমি সন্ধ্যেবেলা এসে দেখা করে যাব!” বলে রুবেল রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই যাচ্ছিল তখনই জুবেদার ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল “কে? ভাইজান নাকি?” রুবেল দেখল জুবেদা এই পাশ ফিরেছে। এক রাতেই মেয়েটাকে কি দুর্বলটাই না লাগছে! অথচ কাল রেহানের সাথে কত খুনসুটি করছিল! রুবেল কাছে এসে জুবেদার মাথায় হাত

বুলিয়ে দিয়ে বলে “এখন তুমি আরাম কর বেটা! আমি সন্ধ্যেবেলায় আসব আবার কেমন?” জুবেদা খুব কষ্টে একটু হাসে! রুবেল সায়েদার সাথে রুম থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল যে এই জ্বর স্বাভাবিক কারণে আসেনি! কিছু তো একটা ব্যাপার আছেই! কিন্তু কি হতে পারে সেটা? লজের বাগানের কাছে এসে পৌঁছাল রুবেল।

পর্ব-৩

“আজকে শরীর কেমন জুবেদা?” রুম থেকে বেরিয়ে রিসেপ্সনের ছোট্ট সোফাটাতে জুবেদাকে শাল গায়ে বসে থাকতে দেখে বলে ওঠে রুবেল। “এখন অনেকটাই ভাল আছি ভাইজান! দুদিন ধরে স্কুল যাওয়া হচ্ছেনা! ইমতেহান আছে সামনেই! কিন্তু আম্মি যেতে দিল না আজকেও!” একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জুবেদা। রুবেল দেখল রামিজ সামনের বাগানের গাছগুলোতে জল দিতে ব্যস্ত। সায়েদা কিম্বা মুজিবকে ধারেকাছে দেখতে পেলনা। এটাই সুযোগ! সে আস্তে করে জুবেদার সামনের সোফাটাতে এসে বসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো “জুবেদা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?” রুবেলের প্রশ্নে একটু অবাক হল জুবেদা।

তারপর অবাক হয়েই বলল “হ্যাঁ করো না ভাইজান!” রুবেল একটু গলাটা নামিয়ে বলল “পরশু রাতে একটা চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছিল! প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো মনের ভুল! কিন্তু এর আগেও যখন এখানে এসেছিলাম এক দুবার এরকম চিৎকার শুনেছিলাম! তবে পরশুদিনেরটা বেশ জোরাল ছিল! তোমারাও কি শুনেছিলে?” জুবেদার মুখটা মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল! জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটদুটো চাটতে শুরু করলো সে! রুবেল জুবেদার দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি! জুবেদাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলে উঠলো “তাহলে মনে হয় শোনোনি কিছু! আমারই মনের...” “ভাইজান ওটা তোমার মনের ভুল নয়!” রুবেলের কথার মাঝেই হঠাৎ করে বলে ওঠে জুবেদা। রুবেল প্রশ্নসূচকভাবে তাকায় জুবেদার দিকে। জুবেদা আস্তে করে বলে “ওটা...ওটা আমার চিৎকার ছিল ভাইজান!” রুবেল অবাক হওয়ার ভান করে বলে “তুমি ছিলে? কিন্তু কেন জুবেদা? কিছু অসুবিধা আছে কি তোমার? আমায় বলতে পারো নিজের ভাইজান ভেবে!” জুবেদা একটা ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করলো “আসলে এটা কোন হঠাৎ করে শুরু হওয়া জিনিস নয়! যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, তবে

থেকেই প্রতি রাতে...” “জুবেদা...নাস্তাতে কি খাবি বেটি?” জুবেদার কথা শেষ হওয়ার আগেই সায়েদা এসে ঢুকল রিসেপ্সনে। রুবেলকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলো সায়েদা “কি মিয়াঁ! আজ বেরোবে না শ্রীনগর সফরে? গল্পের বিষয় পেয়ে গেছো নাকি?” রুবেল একটু বিরক্তই হয়েছিল সায়েদার ঠিক এই সময়ে এখানে এসে উদয় হওয়াতে! তবে মনে হয় ইচ্ছা করেই সে এখানে এসেছে! কারণ সে অথবা তার শোহর মুজিব হয়তো চায়না যে জুবেদার সাথে প্রায় প্রতিরাতে ঘটে চলা কিছু অদ্ভুত জিনিসের বিবরণ কেউ জানুক। আর রুবেল যে সেটা জানতে উৎসুক সেটা কিছুটা মনে হয় আঁচ করেছে সায়েদা! মেয়ে মানুষ বলে কথা! এদের ঘ্রাণশক্তি একজন পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়! তাও আবার যদি ব্যাপারটা নিজের সন্তান সম্পর্কিত হয়, তাহলে তো কথাই নেই! রুবেল বুঝতে পারছিল আর কিছু কথা জুবেদার সাথে সেই বিষয়ে হওয়া সম্ভব নয়! তাই একগাল মেকি হেসে সে জবাব দিল “আরে না না খালা! এত তাড়াতাড়ি কি আর বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়! অনেক মুসক্কত করতে হবে যদি সফলতা পেতে হয়! নাস্তার জন্য ইন্তেজার করছিলাম! খেয়েই বেরিয়ে যাবো!” সায়েদা একটু হেসে রামিজকে

ডাক দিল ”রামিজ, রাবেয়া রান্নাঘরে আছে! সব তৈয়ার করে ফেলেছি দুজনে মিলে! তুই যা আর রুবেল মিয়াঁর জন্য নাস্তাটা রাবেয়ার থেকে নিয়ে চলে আয় জলদি!” রামিজ মাথা নেড়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

রুবেলের মনে যেন শান্তি নেই! তাকে জানতেই হবে কি এমন ব্যাপার যেটা জুবেদার আম্মি আর আব্বু মিলে সবার থেকে লুকাতে চাইছে! সে মনে মনে প্রমাদ গুনতে থাকে কখন জুবেদাকে একা পাওয়া যায়! কিন্তু স্কুলে সে রেহানের সাথে যায় আর আসে। তারপর সায়েদাকে কিচেনে রান্নার কাজে সাহায্য করে, তারপর উপরের ঘরে চলে যায়! রুবেল ভাবতে থাকে কিভাবে জানা যায় পুরো ব্যাপারটা! অনেক ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তার মুখে খেলে যায় এক অদ্ভুত হাসি!

দুদিন পরঃ

“আরে! রুবেল ভাইজান যে! এইদিকে এসেছিলে নাকি কোন কাজে?” স্কুলের গেটের বাইরে সামনাসামনি চায়ের দোকানটাতে রুবেলকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে ওঠে জুবেদা। রুবেল চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে

টাকা মিটিয়ে জুবেদার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল "হ্যাঁ ওই একটা কাজেই এসেছিলাম এই দিকে! তুমি এই স্কুলে পড় সেটা জানতাম না যদিও!" জুবেদা স্মিত হেসে বলল "আচ্ছা ভাইজান! আমি চলি তাহলে!" রুবেল বলে উঠলো "আরে আমিও এবার লজেই ফেরত যাবো! চল একসাথেই যাওয়া যাক! তা রেহানকে দেখছিনা! আজ স্কুলে আসেনি নাকি?" "না ভাইজান! রেহানের কাল থেকেই পেট ঠিক নেই! বিকেলে খেলতে যায় মহল্লার ছেলেগুলোর সাথে তখন কি জানি কি খেয়ে বসে থাকে! ব্যস! হওয়ারই ছিল এসব! আমার কথা তো একটাও শোনেনা! আম্মির কথাও শোনেনা! শুধু আব্বুকে একটু ভয় পায়" বিষন্ন গলায় বলল জুবেদা। রুবেল একটু হেসে বলল "আচ্ছা জুবেদা, সেদিন লজের রিসেপ্সনে বসে কিছু কথা বলছিলে তুমি আমাকে মনে আছে?" জুবেদা অবাক হয়ে রুবেলের দিকে তাকিয়ে বলল "কোন দিন ভাইজান?" "এই তো দুদিন আগেই, যেদিন তোমার জ্বরটা একটু ঠিক হয়েছিল বলে তুমি রিসেপ্সনে এসে বসেছিলে! আমি তোমাকে প্রায় রাতেই শুনতে পাওয়া চিৎকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলাম, মনে পড়ল?" রুবেল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জুবেদার দিকে।

জুবেদা প্রশ্নটা শুনে চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। রুবেলও দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে উঠলো আবার "কি হল জুবেদা? দেখো তুমি সেদিন কিছু বলতে চেয়েছিলে আমাকে কিন্তু সায়েদা খালা চলে আসাতে আর বলে উঠতে পারনি! আমি বুঝেছি সেটা! কিন্তু এখন এখানে তো কেউ নেই...তুমি বলতে পারো..." "না ভাইজান, আমাকে সেসব কথা আম্মি কাউকে বলতে বারণ করেছে! আমি তোমাকে বলতে পারবোনা!" বলে জুবেদা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো। রুবেল জুবেদার সামনে এসে বলল "এসো আমার সাথে, সামনের এই বসার জায়গাটাতে বসা যাক..." "কিন্তু ভাইজান দেরি হয়ে যাবে বাড়িতে ফিরতে! আম্মি ফিকার করবে!" উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলো জুবেদা। "কিচ্ছু দেরি হবেনা! দু মিনিট লাগবে, এসো!" বলে রুবেল আর জুবেদা রাস্তার ধারে একটা গাছের নিচে ছোট বসার জায়গায় গিয়ে বসলো। রুবেল বলা শুরু করলো "দেখ জুবেদা, কিছু কিছু জিনিস আছে যা কাউকে বললে অনেক শান্তি পাওয়া যায়! হয়তো আমি তোমার সেই অসুবিধার কিছু উপায় দিয়ে দিতে পারি!" জুবেদা রুবেলের দিকে তাকাল, তারপর বলল "এর কিছু উপায় নেই ভাইজান! আব্বু বলছে মৌলবি

সাহাবের কাছে এই রবিবারে আমাকে নিয়ে যাবে!” বলতে বলতে চুপ করে গেল জুবেদা। “চুপ করে গেলে কেন জুবেদা? মৌলবি সাহাবের কাছে কেন যেতে হবে? দেখো এতটা যখন বললে বাকিটাও আমাকে খুলে বল! আমি কথা দিচ্ছি তোমার আম্মিকে কিচ্ছু জানাবো না!” রুবেলের কথা শেষ হতেই জুবেদা অস্থির হয়ে বলে ওঠে “ঠিক আছে ভাইজান আমি বলছি কিন্তু দয়া করে খেয়াল রেখো যেন আম্মি কিম্বা আব্বু এটা জানতে না পারে!” রুবেল সম্মতিসূচকভাবে মাথা দোলাল।

“সববার একই স্বপ্ন দেখো? কোন হেরফের নেই?” রুবেল ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো। “হেরফের বলতে একটা জায়গা দেখি, খুব স্পষ্ট না হলেও জায়গাটা আমার দেখা কিম্বা পরিচিত জায়গা নয়! চারিদিকে পাহাড়, সবুজ সবুজ পাহাড়ের মাঝে একটা তাবুমত! এসবের মাঝেই হঠাৎ সেই বীভৎস লোকটা! মুখটা স্পষ্ট না হলেও থুতনির নিচ থেকে বেরিয়ে থাকা সাদা দাঁড়ি আর মাথায় সাদা মত একটা কাপড় বাঁধা! লোকটার বুকে কেউ যেন ছুরি জাতীয় কিছু দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে! লোকটার সেই দৃষ্টি! যেন আমার দিকেই তাকিয়ে থাকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত!

আমি চোখ খুলতে চাইলেও খুলতে পারিনা! আর সেই রাতে...” বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠলো জুবেদার। রুবেল অসম্ভব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো “ সেই রাতে কি জুবেদা? বল আমাকে।“ জুবেদা আস্তে আস্তে বলল “সেই রাতে স্বপ্নটা আরও ভয়াবহ ছিল! লোকটা... তখনও ছুরিবিদ্ধ হয়নি! আমি দেখলাম সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে, মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি! আর আমি যেন পালাতে পারছিনা...কোনভাবেই পারছিনা! তারপর হঠাৎ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপরে! আর তখনই আমি চিৎকার করে উঠি আর ঘুম ভেঙ্গে যায় আমার!” “তার মানে সেদিনের জ্বরটা সেই ভয় থেকেই এসেছিল, তাই তো?” রুবেলের কথায় নীরবে মাথা নাড়ায় জুবেদা, তারপর বলে ওঠে “এবার চল ভাইজান, নইলে আম্মি রেগে যাবে খুব! আর কাউকে বোলোনা এসব কথা দয়া করে! আম্মি বলছিল এসব কোন অপদেবতার জন্য হতে পারে, জানাজানি হয়ে গেলে আমার নাকি আর নিকাহ হবে না!” জুবেদার সরল কথাগুলো শুনে রুবেল তাকে আশ্বস্থ করলো যে সে কিছুই বলবে না কাউকে। তারপর দুজনে রাস্তায় নেমে এল।

“হ্যালো শান্তনুদা? কেমন আছো?” ফোনটা অপরপ্রান্ত

থেকে রিসিভ হতেই বলে উঠলো রুবেল। "আমি ভালো ভায়া! কিন্তু তোমার কি খবর? আজ এতোগুলো বছর পরে আমাকে হঠাৎ মনে পড়লো?" শান্তনুর কথার জবাবে রুবেল বলল "না গো সেরকম কিছু নয়! আসলে নিজের কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম! বাড়িতেই বছরের ৮ মাস থাকা হয়না!...আচ্ছা শোনোনা শান্তনুদা, তোমার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে! তুমি কখন ফ্রি হবে একটু জানালে ভাল হতো!" শান্তনু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল "এই সন্ধ্যের পর থেকে তো রাত প্রায় ১০:৩০ অব্দি আমার একদম সময় হবেনা, পেসেন্ট দেখতে হয়!" "ঠিক আছে দাদা, আমি যদি ১১টার পর ফোন করি, কিছু অসুবিধা হবে কি?"রুবেলের কথা শুনে শান্তনু বলল "না অসুবিধা নেই! কি ব্যাপার বলতো এবার! এত কি আর্জেন্ট আছে?" রুবেল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বলল "কিছু জানার আছে তোমার থেকে!" "আমার থেকে? একজন উঠতি লেখকের আমার মত মনচিকিৎসকের কাছ থেকে কি জানার থাকতে পারে ভায়া?" রসিকতা করে বলল শান্তনু। "সব বলবো দাদা! রাতে তবে ফোন করছি। ঠিক আছে?" বলে উঠলো রুবেল। "হম ঠিক আছে ভায়া!" বলল ডাঃ

শান্তনু।

কয়েকদিন পরঃ

“জুবেদা একটু শোনো এদিকে!” চাপা গলায় আস্তে করে বলল রুবেল। জুবেদা স্কুল থেকে ফিরে উপরের ঘরে যাচ্ছিল। রেহান আগে আগে দৌড়ে চলে গেছিল, জুবেদা পিছন পিছন ঢুকছিল, তখনই রিসেপ্সনের কাছে রুবেল জুবেদাকে ডাক দেয়। “বল ভাইজান, কিছু বলবে?” বলে জুবেদা এগিয়ে গেল রুবেলের দিকে। “হম, তোমার প্রব্লেমের একটা উপায় পেয়েছি আমি! কিন্তু তার জন্য তোমাকে আমার সঙ্গ দিতে হবে জুবেদা!” বলে থামল রুবেল। “কিরকম সঙ্গ ভাইজান?” প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো জুবেদা। “বলবো! কিন্তু এই ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছু জানাবে না, কেমন?” রুবেলের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো জুবেদা, তারপর বলল “এসব করে কি আমার সেই স্বপ্নগুলো আসা বন্ধ হয়ে যাবে ভাইজান?” রুবেল অন্যমনস্ক হয়ে বলল “সেটা জানিনা, তবে কেন হচ্ছে এসব, কি থেকে হচ্ছে তার উত্তর পেলেও পাওয়া যেতে পারে!” “ঠিক আছে ভাইজান! আমাকে করতে কি হবে?” জুবেদা তাকাল রুবেলের দিকে।

“কবে থেকে এরকম স্বপ্ন দেখছ তুমি জুবেদা?” ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ডাঃ শান্তনুর কথায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে জবাব দেয় জুবেদা “অনেক ছোট থেকে! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত সবকিছু স্পষ্ট হচ্ছে...” “স্পষ্ট হচ্ছে মানে? কি স্পষ্ট হচ্ছে জুবেদা?” ডাঃ শান্তনুর কথা শুনে জুবেদা বলল “স্পষ্ট মানে সেই জায়গাগুলো, সেই লোকটা...সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি...” কথা শেষ না করেই কাঁপতে শুরু করলো জুবেদা। “হ্যালো...হ্যালো জুবেদা?” ডাঃ শান্তনু বারবার বলতে লাগলেন। “হ্যালো শান্তনুদা, জুবেদা কথা বলার মত অবস্থায় নেই, এই ব্যাপারে বেশিক্ষণ কথা বললেই ও ভয় পেতে থাকে! আমি তোমাকে একটু পরে কল করছি” বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল রুবেল।

“কি বুঝলে শান্তনুদা? মেয়েটার কি কিছু মানসিক প্রব্লেম থাকতে পারে?” রুবেলের কথা শুনে ডাঃ শান্তনু বলল “দেখো রুবেল এইভাবে একদিন দুটো কথা তাও আবার ফোনে বলে আমি কেন আমার চেয়ে আরও অনেক বড় মন চিকিৎসকও বলতে পারবে না যে মেয়েটি মানসিকভাবে সুস্থ না অসুস্থ! তবে হ্যাঁ,

এইটুকু বলতে পারি যে মেয়েটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছে! এবার সেটাকে আমি মানসিক রোগ বলে অভিহিত করতে পারিনা! আমার সিটিং চাই মেয়েটার সাথে, সামনাসামনি! অনেকগুলো সিটিং! তবে হয়তো কিছু কিনারা করতে পারা যাবে! যাই হোক একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? কিছু মনে করোনা প্লিস!" রুবেল বলল "না না বল!" ডাঃ শান্তনু একটু থেমে বলল "তুমি হঠাৎ এই মেয়েটা মানে জুবেদার জন্য এত তৎপরতা দেখাচ্ছ কেন? ওর মা বাবা কি জানে যে ও আমার সাথে কথা বলেছে? লেখালিখি ছেড়ে এবার জনসেবায় মন দিলে নাকি ভায়া?" রুবেল কি জবাব দেবে ভাবছিল। তার মনে কি চলছিল সেটা একমাত্র সেই জানতো! কথা ঘুরিয়ে বলল "আরে না গো, সেরকম কিছু নয়! আসলে মেয়েটা বহুদিন ধরে এরকমভাবে ভুগছে আর আমিও এদের অনেক বছর ধরে চিনি তাই ভাবলাম যদি একটু হেল্প করে দেওয় যায় আর কি! ঠিক আছে শান্তনু দা! রাখলাম তাহলে, পরে আবার কল করবো! অনেক ধন্যবাদ তোমার হেল্পের জন্য!" বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে চিন্তা করতে বসলো রুবেল। কি করা যাবে এটা ভাবতে ভাবতে বিছানায় রাখা ল্যাপটপটা তুলে নিল সে, শুরু তো হোক, শেষটা

হতে এখনও অনেকগুলো পর্ব বাকি!

পর্ব-৪

একটা অদ্ভুত বিকট আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল রুবেলের। না! আজকে কিন্তু এই আওয়াজটা জুবেদার চিৎকারের আওয়াজ বলে মনে হল না! রুবেল ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলো। কেন জানিনা হঠাৎ করেই বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে তার! গায়ের কম্বলটা ভালোভাবে মুড়ি দিয়ে মাথাটা উঠিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো যে রুমের কোন ফাঁকফোকর দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে কিনা! কিন্তু কিছুই সেরকম দেখতে পেলনা। এর কয়েক মুহূর্ত পরই দুমদাম আওয়াজ আসতে লাগলো! মনে হচ্ছে কেউ যেন দরজাটা সর্ব শক্তি দিয়ে পেটাচ্ছে! রুবেল এবার একটু যেন ভয় পেল। দরজার দুমদাম আওয়াজটা যেন থামার নামই নিচ্ছে না! রুবেল না চাইতেও গায়ের কম্বলটাকে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল। তারপর আস্তে করে নিজের রুমের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল। আজকেও অন্যদিনের মত করিডরে টিমটিমে আলোটা জ্বলছে! অন্যদিন কিছু মনে না হলেও আজকে কেন জানিনা রুবেলের একটু গাটা ছমছম করছিল! তাড়াতাড়ি

করিডরটা পেরিয়ে রিসেপ্সনে এসে দেখে মেন দরজাটা বন্ধ! কিন্তু পাশের বড় জানলাটার একটা পাল্লা সম্ভবত কোন কারণে খুলে গেছে আর বাইরে প্রচণ্ড হিমশীতল হাওয়া বইছে আর সেই হাওয়ার জন্যই জানলাটা দুমদাম আওয়াজে ধাক্কা মারছে বারবার! রুবেল একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলাটার পাল্লাটা বন্ধ করতে এগিয়ে গেল! জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে বাইরের বাগানে হঠাৎ নজর পড়ে তার! দেখে একটা অস্পষ্ট অবয়ব সম্ভবত দাঁড়িয়ে আছে সেখানে! "কে? কে ওখানে?" বলতে গিয়ে ঈষৎ গলাটা যেন কেঁপে গেল রুবেলের! ঘন কুয়াশা আর তাতে অদ্ভুত এক হিমশীতল পাগল করা হাওয়া! কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না! রুবেল আর একটু জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। আস্তে আস্তে যেন কুয়াশার চাদর সরে যাচ্ছে বলে মনে হতে লাগলো তার! আর অস্পষ্ট অবয়বটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগলো! অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি! মাথা সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিত! গায়ে একটা গেরুয়া রঙের কিছু আর দৃষ্টি যেন রুবেলের দিকে স্থির! "কেউ আছেন ওখানে?" গলাটা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলো রুবেল। কিন্তু সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন হোলদোল দেখা গেলনা! যেন

কোন মূর্তি একইভাবে একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস হল এই অসম্ভব হিমশীতল হাওয়ার মাঝেও সেই ব্যক্তির শরীরে তেমন কিছু আবরণ নেই! আর তার জন্য যে তার ঠাণ্ডা লাগছে সেরকম কিছু অভিব্যক্তিও মুখে ফুটে উঠছে না! রুবেলের এবার কেন জানিনা সত্যিই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে লাগলো! এই অনুভূতি ভয়ের নাকি কৌতূহলের সেটা রুবেলের বোধগম্য হচ্ছিল না এই মুহূর্তে! সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে একটা সুমিষ্ট গন্ধ পাচ্ছে সে অনেকক্ষণ থেকে!কিসের গন্ধ কিছুতেই মনে করতে পারছে না! না! মনে হয় চোখের ভুল! এসব ভাবতে ভাবতে জানলা থেকে নজর সরাতেই গেছিল রুবেল তখনই একটা আওয়াজ কানে এল। এক অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষায় কেউ যেন কিছু একটা মন্ত্র পড়া শুরু করেছে! জানলার কাছে আবার গিয়ে দেখে রুবেল সেই ব্যক্তিটা যেন কিছুটা এগিয়ে এসেছে! মুখটা তাও অস্পষ্ট! কিন্তু ঠোঁটদুটো মনে হচ্ছে নড়ছে সমানে! মন্ত্রটা তাহলে সেই পড়ছে কি? রুবেল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল! নড়তেও ভুলে গেল যেন! হঠাৎ সেই মন্ত্রপাঠ থেমে গেল! এবার সেই ব্যক্তি যেন কিছু একটা বলে উঠলো রুবেলের দিকে তাকিয়ে! খুবই

অস্পষ্ট আওয়াজ আর সেই দুর্বোধ্য ভাষা! রুবেল নির্বোধের মতই তাকিয়ে রইল! এবার আস্তে আস্তে সেই ব্যক্তি পিছনের দিকে ফিরে চলে যাওয়ার উপক্রম করতে লাগলো। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে রুবেলের দিকে তাকাল শেষবারের মত! তারপর নিজের ডানহাতের তর্জনীটা তুলে দুদিকে হেলালো! তারপর হঠাৎ করেই যেন কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল! রুবেল যেন এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল! মানুষটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল সে! কে ছিল সে? কেনই বা এই মাঝরাতে এখানে এসেছিল? আর কিসের জন্য মানা করে গেল রুবেলকে? কিছুই বুঝতে পারছিল না রুবেল! জানলার সামনে থেকে খানিকটা টলমল পায়ে সরে আসতেই যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলো রুবেল! সিঁড়ির কাছের আলো আধাঁরিটাতে জুবেদা দাঁড়িয়ে রয়েছে! চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকমের শান্ত! কিছুক্ষণ পরে হালকা হাসল জুবেদা রুবেলের দিকে তাকিয়ে! অন্যসময় একরকম লাগে! কিন্তু এই মাঝরাতে সিঁড়ির কাছে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয় জুবেদার! এবার নিজের মনেই কিসব বলা শুরু করেছে জুবেদা ফিসফিস করে! রুবেল তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে

প্রায় ছুটে নিজের রুমের সামনে গিয়ে পৌঁছায়! ছুটে আসার সময় জুবেদার একটাই কথা তার কানে আসে "ওরা এসে গেছে!"

পরের দিন অনেকটাই দেরিতে ঘুম ভাঙল রুবেলের। ঘুম ভাঙতেই কালকে রাতের কথা মনে পড়ে গেল তার! সবটাই একটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল তার! নিজেকে সামলে মোবাইলটা খুলে টাইমটা দেখল, প্রায় ৯টা বাজতে চলেছে! উঠে বাথরুমে গিয়ে স্নানটান সেরে রুম থেকে বেরিয়ে এল রুবেল। রিসেপ্সনে এসে দেখল সায়েদা বসে আছে! রুবেলকে দেখতে পেয়ে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলল "কি মিয়াঁ! রাত জেগে লেখালিখি চলছে নাকি? রামিজ দুবার গিয়ে ফিরে এসেছে! তুমি এত ঘুমচ্ছিলে যে দরজা ঠকঠকের আওয়াজও পাওনি মনে হয়!" রুবেল কষ্ট করে একটু হাসে। তারপর কি মনে হতে বলে "জুবেদা, রেহান কি স্কুলে নাকি?" সায়েদা অল্প হেসে বলে "হ্যাঁ, ওরা তো সেই আটটায় বেরিয়ে গেছে! তা, তোমার নাস্তাটা রামিজকে নিয়ে আসতে বলি?" "না খালা! আজকে শরীরটা খুব একটা ভালো নেই! কিছু খাবনা! একটু বেরিয়ে আসছি!" বলে রুবেল বেরিয়ে যেতে গেল। "আরে মিয়াঁ, শরীর খারাপ তো লজেই আরাম করো!

বাইরে তো খুব ঠাণ্ডা! শরীর বেশি খারাপ হয়ে যেতে পারে!” পিছন থেকে বলে উঠলো সায়েদা। রুবেল ততক্ষণে লজের বাগান পেরিয়ে মেন গেটের কাছে পৌঁছে গেছে। সায়েদার কথা শুনে একটু চিৎকার করে বলল “না না খালা তেমনও কিছু শরীর খারাপ নয়! একটু ঘুরে ফিরে এলে ভালই লাগবে!” বলে উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বেরিয়ে এল রুবেল।

সামনের ডাল লেকের পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে কালকে রাতের ঘটনাগুলোর কথা ভাবছিল রুবেল। ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না তার! তবে কি জুবেদার স্বপ্ন দেখা আর তার এই জেগে জেগে এসব দেখার মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে? না! আজকে জুবেদার সাথে কথা বলতেই হবে তাকে! এসব ভাবতে ভাবতে মেন রাস্তায় এসে পড়ে রুবেল।

জুবেদার স্কুলের সামনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কি মনে হতে ফিরে চলে আসে রুবেল। রেহান থাকবে আজকে জুবেদার সাথে! কিছু সেরকম জিজ্ঞেস করা যাবেনা! কিছু জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেই রেহান এটার মানে কি ভাইজান, ওটার মানে কি ভাইজান এসব বলতে শুরু করবে! কিন্তু জুবেদার

সাথে কথা বলাটা খুব জরুরি! তাকে জানতেই হবে এসব হচ্ছেটা কি! যেন সব কিছু জানার একটা নেশা পেয়ে বসেছে রুবেলকে!

“জুবেদা! তোমার সাথে কিছু কথা আছে!” জুবেদা স্কুল থেকে ফিরলে বাগানে বসে থাকা রুবেল বলে উঠলো। “কি কথা ভাইজান?” জুবেদা তাকাল রুবেলের দিকে। “ ফ্রেশ হয়ে এসো তারপর বলছি!” রুবেলের কথা শুনে জুবেদা বলল “ঠিক আছে ভাইজান! আসছি।“
“জুবেদা, কাল রাতে তুমি সিঁড়ির ওখানে কি করছিলে?” কোনরকম ভনিতা না করেই বলে উঠলো রুবেল। “আমি? আর রাতে সিঁড়ির কাছে? কিসব বলছ ভাইজান!” যেন প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে উঠলো জুবেদা। রুবেল চোখদুটোকে সরু করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলল “কারা এসে গেছে জুবেদা? কি হচ্ছে এসব? বলো আমাকে প্লিস!” জুবেদা অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল রুবেলের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল “তুমি যেসব কথা বলছ ভাইজান সেরকম একটা স্বপ্ন কাল রাতে আমি দেখেছি!” “স্বপ্ন? ওটা স্বপ্ন ছিলনা জুবেদা! আমি সাক্ষী তার! ওটা বাস্তব ছিল! কে ছিল সেই অদ্ভুত লোকটা? আগে কখনো

তাকে দেখেছো নিজের স্বপ্নে?” প্রচণ্ড উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রুবেল। জুবেদা ইতস্তত করতে থাকে। রুবেল অধৈর্য হয়ে বলে “জুবেদা প্লিস বল! আমার জানাটা খুব জরুরি!” সন্ধ্যে নেমে আসছিল। হঠাৎই রুবেলের বেশ শীত করতে লাগে! জুবেদা সামনে মাথাটা নামিয়ে বসে আছে। ওর কি শীত লাগছে না? নাকি একা তারই লাগছে! হঠাৎ চারপাশটাতে সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশা ছেয়ে যেতে শুরু করলো। “জুবেদা?” ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলো রুবেল। না! জুবেদা মুখ তুলছে না তাও! কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তোলে জুবেদা। সেই হাসি! আগের দিনের রাতের মত! জুবেদা আবার বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুরু করেছে! রুবেল অসম্ভবরকম বিস্মিত হয়ে জুবেদার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বিড়বিড় করা থামিয়ে সরাসরি রুবেলের দিকে তাকাল। তারপর ফাঁসা গলায় বলল “সসসস!!! ওরা শুনে ফেলেছে! ওরা দেখেও ফেলেছে! ওরা অন্য কারুর দেখা কিম্বা জানাটাকে পছন্দ করেনা!” বলে নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনীটা ঠেকাল জুবেদা। জুবেদার এরকম কথায় রুবেল খুব অবাক হয়ে গেল আর সাথে একটু একটু ভয়ও পাচ্ছিল। “জুবেদা...জুবি

কোথায় গেলি? ওহ! এখানে! চল রাতের রান্নার কাজটা সেরে নিতে হবে যে বেটা!” সায়েদার গলার আওয়াজে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল জুবেদা। নিজের চোখদুটো রগড়ে রুবেলের দিকে তাকাল। রুবেল তখনও বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে জুবেদার দিকে! জুবেদা কিছু বলার আগেই সায়েদা এগিয়ে এল তাদের দিকে। “কি মিয়াঁ, এখন শরীর কেমন?” সায়েদার প্রশ্নটা যেন ঠিকমতো শুনতেই পায়নি রুবেল। সায়েদা কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো রুবেলের দিকে। “কি মিয়াঁ? কিছু হয়েছে?” একটু গলাটা তুলে আবার জিজ্ঞেস করলো সায়েদা। এবার রুবেল যেন শুনতে পেল। “না কিছু হয়নি! আমি রুমে যাচ্ছি!” বলে তড়িঘড়ি চেয়ার থেকে ছিটকে রুমের দিকে চলে গেল রুবেল। সায়েদা অবাক হয়ে একবার জুবেদার দিকে তাকাল। তারও চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

“এই রহস্যের কিনারা করাটা তোমার কাজ নয়! ওনার ব্যাপারে কোন অযাচিত লোক উৎসাহ দেখালে তার পরিণাম ভয়াবহ হয়! আগেও বুঝিয়েছি আবারও বলছি! নিজের কাজ করো। নাহলে...প্রলয় আসবে! প্রলয়!” সেই লোকটা, পরনে গেরুয়া বস্ত্র, মুণ্ডিত

মস্তক! কিন্তু আজকে সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কোন মন্ত্র উচ্চারণ নেই, বরং পুরোটাই বোধগম্য ভাষায় এক সতর্কবার্তা দিচ্ছে! রুবেল যেন হিলতে পারছেনা! কোন অশরীরী শক্তি যেন তাকে বেঁধে রেখেছে! লোকটা স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে এখন তার দিকে! তারপর কাছে এসে বলল "সসসস!!!! ওরা তোমাকে পছন্দ করেনা! তোমার এইসব কাজে ওরা খুব বিরক্ত! আর উনি কিন্তু জানতে পারলে আর রক্ষে নেই! এটা আমার সর্বশেষ সতর্ক বার্তা!..." পরের কথাগুলো আর শুনতে পেলনা রুবেল। অস্পষ্ট কিছু মশালের মত আলো দেখতে পেল অদূরে। আর সাথে একদল লোক। নিঃশব্দে কোথাও চলেছে তারা! যেন তাদের পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছেনা! হঠাৎ সেই দলের একজন চোখ গিয়ে পড়লো রুবেলের উপর! তারস্বরে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলে উঠলো সে! তখনই বাকি সবাই মিলে তরোয়াল বের করে রুবেলের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে শুরু করলো। রুবেলের পা দুটো যেন কেউ মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে! সে এক ইঞ্চি নড়তে পারছেনা! ওরা এসে গেছে! অনেক কাছে! এবার হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে.....। "রুবেল মিয়াঁ! দরজা খোলো, আমি রামিজ! কফি নিয়ে এসেছি!"

দরজার ঠকঠক আওয়াজ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো রুবেল।স্বপ্ন দেখছিল তার মানে এতক্ষণ সে! কিন্তু এত পরিষ্কার, এত প্রানবন্ত কি স্বপ্ন হতে পারে? এই তুমুল শীতেও রুবেল ঘেমে উঠেছে। রামিজ মনে হয় চলে গেছে! কতক্ষণ থেকে দরজা ঠকঠক করছিল কে জানে! বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইলো রুবেল। স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি এখনও তার! তারপর কিছুটা ধাতস্থ হতে বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসে সে।

সেদিন আর কোথাও বেরোল না রুবেল। রুমে বসে সারাদিন নিজের ল্যাপটপে কাজ করে গেল। মাঝে রামিজ এসে নাস্তা আর পরে লাঞ্চ দিয়ে গেছিল। অনেকগুলো লিঙ্ক ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো নিজের ল্যাপটপের নোটপ্যাডে সেভ করে রাখল রুবেল। সব কিছু সার্চিং শেষ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। এবার ল্যাপটপটা বন্ধ করে একটু রুমের বাইরে বেরিয়ে এল রুবেল। “না! আজকের দিনটা বৃথা গেলনা! অনেক কিছুই এবার বুঝতে পারছি আমি একটু একটু করে! “মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতেই রিসেপ্সন পেরিয়ে সামনের বাগানটাতে এসে বসলো রুবেল। লজটা এত ফাঁকা

ফাঁকা লাগছে কেন? রামিজ তো থাকে অন্যদিন রিসেপ্সনে! আজ রিসেপ্সনও ফাঁকা! অদ্ভুত মনে হলেও সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সামনের টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিল রুবেল। কিছুক্ষণ পর তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন জানান দিতে লাগলো যে তার আশে পাশে কেউ আছে! খবরের কাগজটা মুখের সামনের থেকে নামাতেই একটু আঁতকে উঠলো রুবেল। সামনে জুবেদা বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখ! "ওহ জুবেদা! কখন এলে, বুঝতেই পারিনি!" রুবেলের কথার কোন জবাব না দিয়ে জুবেদা আঙ্গুল তুলে বাগানের একদম শেষ কোণার বড় মত গাছটার দিকে নির্দেশ করে ফাঁসা গলায় বলে উঠলো "তোমাকে উনি ডাকছেন!" রুবেল অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো! সন্ধ্যের আঁধার ততক্ষণে চারপাশটাতে নামতে শুরু করে দিয়েছে!

পর্ব ৫

হাত নেড়ে ডাকছে সে! আজ মুখের স্নিগ্ধভাবটা আর নেই! বরং অনেক বেশি ভীত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হচ্ছে তাকে! রুবেল আর তাকিয়ে থাকতে পারছিলনা। চোখগুলো জ্বলতে শুরু করেছে তার! মাথাটা ঘুরছে!

হঠাৎ করেই লোকটা গাছের তলা থেকে বেরিয়ে গেরুয়া চাদরটাকে জড়িয়ে দ্রুত পায়ে রুবেলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে! রুবেল বিস্ফোরিত চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর বাগানের চেয়ারটা ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়! জুবেদা আর নেই এখানে! কোথায় গেল, আর কখনই বা গেল? এসব ভাবতে ভাবতেই দেখে লোকটা অনেকটা সামনে এসে পড়েছে! আবারও সেই সুমিষ্ট গন্ধটা পাচ্ছে রুবেল! মনে পড়েছে এবার তার! এটা চন্দনের গন্ধ! কিন্তু এত কিছু ভাবার সময় নেই আর তার! সে প্রায় এক ছুটে বাগান ছেড়ে লজের রিসেপ্সনে এসে পৌঁছায়। সেই দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ আবার শুরু হয়েছে, ঠিক সেদিনের মত! সভয়ে পিছন ফিরে দেখে লোকটা বাগানের চেয়ারের পাশটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কুয়াশার ঘন চাদর যেন তাকে ছুঁতেও নারাজ! আবারও সেই আঙুল তুলে মানা করে উঠলো সে! কিসের মানা সেটা কিছুটা হলেও এবার বুঝতে পারছিল রুবেল।

জ্বরে সারা শরীর কাঁপছে রুবেলের! কিছুতেই জ্বরটা নামছে না তার! “রামিজ, যা তো একবার ডাক্তারবাবুকে খবরটা দিয়ে আয়! মিয়াঁর জ্বরটা তো একদমই নামছে না!” বলে উঠলো মুজিব। রামিজ মাথা

হেলিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

“রোগীর জ্বরটা ভালোই আছে! ইঞ্জেকশন দিলাম একটা। আর কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি আজকে নয়তো কাল সকালের মধ্যে কিনে এনে এনাকে দেওয়া শুরু করতে হবে! আর তাও যদি শরীর ঠিক না হয় তাহলে আমাকে একবার খবর দিয়ে দেবেন! আসি আমি!” বলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যেতেই সায়েদা এসে রুবেলের রুমে ঢুকল। রুবেল তখন ইঞ্জেকশন আর জ্বরের প্রভাবে বেহুঁশ। বেশ কিছুক্ষণ রুবেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সায়েদা বলল “রিসেপ্সনে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল মিয়াঁ!দুপুর অব্দি তো ভালই ছিল! তারপর কি হল কি জানি! আল্লাহর রেহেম যে রামিজ সময়ে দেখতে পায় রুবেল মিয়াঁকে! না জানি কতক্ষণ সেইভাবেই পড়ে ছিল!” মুজিব একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে “কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ! তখন রুবেল মিয়াঁর বাড়ির লোককে খবর দিতে হবে! দেখা যাক কাল অব্দি কেমন থাকে!” মুজিবের কথা শুনে সায়েদা নিঃশব্দে মাথা হেলালো।

“ওরা তো আগের থেকেই সব জানতো কিন্তু এবার উনিও জেনে গেছেন! আর কিন্তু রক্ষে নেই! আমি

তোমাকে আগাম সতর্কবার্তা দিয়েওছিলাম, কিন্তু তুমি শোনোনি! এবার বাজবে প্রলয়ের ডঙ্কা! উনি কাউকে ক্ষমা করেননা! কাউকে না! ওনার যুদ্ধের মাঝে যেই আসবে, তাকে তার মূল্য দিতে হবে! আর সেই মূল্য তাকে তার নিজের প্রাণ দিতে চোকাতে হয়...” গগনভেদী এক চিৎকার শুরু হল এরই সাথে! বারবার যেন অনুরণিত হতে থাকলো “মূল্য দিতে হবে নিজের প্রাণ দিয়ে...” আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল রুবেলের। কি ভয়ানক স্বপ্ন! স্বপ্ন নাকি অন্যকিছু? রুবেলের গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! ঘুম ভেঙ্গে কিছুটা ধাতস্থ হতে নিজের শরীরের দুর্বলতাটা টের পেল সে! “আমি রুমে কখন এলাম? আমি তো বাগানে...” ভাবতে গিয়ে একটা ভয়ের স্রোত যেন তার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল। নিজেকে সামলে অনেক কষ্টে উঠে বসলো সে! আজ ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে! এখন কত রাত কে জানে! বিছানার সাইড টেবিলটাতে হাত বাড়িয়ে জলের জগটা টেনে আনল রুবেল। তারপর পাশে রাখা কাঁচের গ্লাসটাতে জল ঢালতে শুরু করলো। জলের গ্লাসে এক চুমুক সবে দিয়েছে তখনই ঝুপ করে ঘরের নাইট ল্যাম্পটা নিবে গেল। আচমকা এরকম হওয়াতে রুবেল প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। এমনিতে তার

লাইট সব অফ করেই শোয়া অভ্যেস! তাই অন্ধকারে এরকম কিছু মনে হওয়া তো উচিত নয় কিন্তু একে জ্বরে শরীর দুর্বল তার উপর কদিন ধরে ঘটে চলা এসব অদ্ভুত ঘটনার জন্য রুবেলের বেশ ভয়ই করছিল! হঠাৎ একটা খুব মৃদু গুনগুন আওয়াজ কানে এল রুবেলের! আওয়াজটা মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছে! কিন্তু সেটা কি এগিয়ে আসছে ক্রমশ? ধীরে ধীরে যেন পরিষ্কার হচ্ছে আওয়াজটা! কেউ গাইছে, কোন মেয়ে! কিন্তু গাইছেটা কি সেটা বোঝা যাচ্ছেনা! গানের আওয়াজটা করিডর হয়ে রুবেলের রুমের দরজা পর্যন্ত এসে গেছে! খুবই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে! কিন্তু কথাগুলো বোধগম্য নয়!"কে? কে ওখানে?" কাঁপা গলায় বলে উঠলো রুবেল। গানটা সেই মুহূর্তে থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ এক অস্বাভাবিক নীরবতা। তারপর হঠাৎই যেন একটা চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এল রুবেলের কানে! খুবই ক্ষীণ! কিন্তু শীতের রাতের নিস্তব্ধতার জন্য মনে হয় এত ক্ষীণ আওয়াজও কানে এল রুবেলের! পরক্ষণেই মনে হল কেউ যেন রুবেলের দরজার বাইরে থেকে করিডর ধরে ছুটে যাচ্ছে! কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে! ক্রমশ সেই চিৎকারের আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছে যেন! রুবেল এটা

সেটা ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে অতি কষ্টে নেমে আসে। তারপর মোবাইলটা হাতড়ে বের করে মোবাইল থেকে আলোটা জ্বালাল। মুহূর্তেই নিকষ অন্ধকারের গভীরতাটা আলোর অনুপ্রবেশের ফলে ম্লান হয়ে গেল! গায়ে একটা মোটা শাল জড়িয়ে টলোমলো পায়ে রুমের দরজাটা সভয়ে খুলে বেরিয়ে এল রুবেল। করিডরটাও অন্ধকারে ডুবে আছে! না কেউ নেই করিডরে! তবে কি যে এসেছিল সে চলে গেছে? কিন্তু এই মাঝরাতে ভিতর থেকে বন্ধ লজে কেই বা আসতে পারে? প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে রুবেলের! লজটা পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে আছে যেন! শুধু এই লজটাই নয় এমনকি আশেপাশের কোন দিক থেকেও আলোর লেশমাত্র দেখা যাচ্ছেনা! তবে আজকে চাঁদ উঠেছে বেশ সুন্দরভাবে! একদম ঈদের চাঁদের মত! এদিকে চিৎকারটাও আর শোনা যাচ্ছেনা! তবে কি জ্বরের ঘোরে ভুল শুনল সে? হবে হয়তো! রিসেপ্সন অব্দি আসার আগেই ফিরে যাচ্ছিল সে কিন্তু তখনই মনে হল যেন কেউ ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে! চট করে পিছনে ফিরতেই একরাশ হিম শীতল হাওয়া তাকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল! এতটাই শীতল সেই হাওয়া যার প্রভাবে রুবেলের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠলো। একটু ধাতস্থ হতেই তার চোখ যায়

লজের মেন দরজার দিকে! দরজাটা খোলা মনে হচ্ছে যেন! একরাশ কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যায় সেদিকে রুবেল।

দরজাটা খোলা! আবার সেই চিৎকারটা শোনা যাচ্ছে! রুবেল মন্ত্রমুগ্ধের মত দরজা ছেড়ে বাগানে এসে পৌঁছায়! সে ঠাহর করার চেষ্টা করতে থাকে আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে! কোন এক মন্ত্রবলে সে লজের বাগান পেরিয়ে মেন গেট খুলে বেরিয়ে আসে। ধীরে ধীরে গলির মধ্যে হাঁটতে থাকে সে আর চেষ্টা করতে থাকে চিৎকারের উৎসটা ঠিক কোনদিকে! এইভাবে একসময় ডাল লেকের ধারে এসে পৌঁছায় সে! লেকের অপরপারে অনেকটা দূরে কিছু আলোর চলমান উৎস তার চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে সেই আলোর উৎসগুলো লেকের দিকেই এগিয়ে আসছে আর সাথে সেই চিৎকার আর এবার যেন কিছু ঘোড়ার ক্ষুরেরও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল! রুবেল আবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলো।

অনেকটা এসে গেছে এবার তারা! ঘোড়সওয়ারগুলোর প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বিশালাকার তরোয়াল! প্রত্যেকেই লম্বাটে টাইপের একরকমের কিছু পোষাক পড়ে আছে! আলো আঁধারিতে সবটা পরিষ্কার ঠাহর

করা যাচ্ছেনা। রুবেল দুপা এগিয়ে এসে দেখার চেষ্টা করে। মনে হচ্ছে তারা একেবারেই লেকের ওই পাড়ে নেই বরং অদ্ভুতভাবেই তারা লেকের একদম মাঝখানটাতে এসে দাঁড়িয়েছে! রুবেল যেন কিছু ভাবনা বা চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে! লেকের অন্য এক প্রান্ত থেকে আরেক দল ঘোড়সওয়ার দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে! এখন দুটো ঘোড়সওয়ারের দল পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! দুটো দলের মাঝে ঢিল ছোঁড়া দুরত্ব এখন! আস্তে আস্তে এবার যেন চারপাশটা হঠাৎই বদলে যেতে থাকে! রুবেল তাকিয়ে দেখে লেকের জলটা আর নেই বরং সেটা এক এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিতে পরিণত হয়েছে! চারপাশের বাড়িঘর, হাউসবোট কিচ্ছু নেই বরং ধু ধু বিস্তৃত পার্বত্য এলাকায় পরিণত হয়েছে! চাঁদের আলো আর দেখা যাচ্ছেনা! শুধু দুই পক্ষের মশালগুলো ধিকিধিকি জ্বলে যেন যুদ্ধ পূর্ববর্তী নীরবতাকে বয়ান করে চলেছে! এরপর প্রথম ঘোড়সওয়াদের দলনেতা কিছু একটা দুর্বোধ্য ভাষায় বলে উঠলো! ভাষাটা না বুঝতে পারলেও সেটা যে যুদ্ধের হুংকার তা বুঝতে বাকি রইল না রুবেলের! চকিতেই রে রে করে দুই পক্ষের ঘোড়সওয়াররা ছুটে আসতে থাকলো! তারপর

শুরু হল এক অসম তুমুল যুদ্ধ! যার সাক্ষী হয়ে রইল রুবেল! অসম এই কারণেই যে অপর পক্ষের সেনারা বেশিক্ষণ সেই প্রথম পক্ষের সেনাদের সামনে টিকতে পারলনা! দলে দলে সব ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে ধরাশায়ী হতে থাকলো! সবশেষে পরাজিত দলের দলনেতা, বেশ সুসজ্জিত পোষাকে পরিহিত যে, তাকে বিজয়ী দলের দলনেতার সামনে এনে দাঁড় করানো হল! বিজয়ী দলনেতা মনে হয় ভেবেছিল সেই পরাজিত দলনেতা নিজের প্রাণভিক্ষা করবে! কিন্তু সে নিচু গলায় কিছু একটা বলে ওঠে! যেটা শোনা মাত্রই বিজয়ী নেতা তার হাতের তরবারি দিয়ে সেই পরাজিত দলের নেতার মুণ্ডচ্ছেদ করে দেয়! ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে! রুবেল আঁতকে ওঠে এবার! তারপর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতে থাকে! কিন্তু পারেনা! কেউ যেন তাকে আটকে দিয়েছে ওখানেই! আবার সামনের দিকে নজর যেতেই সে দেখে কিচ্ছু নেই সেখানে! পুরো ফাঁকা! শুধু একটা তাবু মাঝখানে রয়েছে যার ভিতরে দুজন নরনারী আছে সম্ভবত সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে কারণ ভিতরে প্রদীপ জাতীয় কিছু আলোর উৎস রয়েছে সম্ভবত যার জন্য তাদের দুজনের ছায়া রুবেলের সামনে প্রকট হয়ে

উঠেছে বাইরে থেকেই!

পুরুষ অবয়বটা নারী অবয়বটার সাথে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে! আবার মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে রুবেল! পুরুষ অবয়বটা নারী অবয়বটার পোষাক টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে সম্ভবত কিন্তু পেরে উঠছে না কেন জানিনা! এরকম ধস্তাধস্তি বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎই এক গগনভেদী আর্তনাদ ভেসে আসে তাবুর ভেতর থেকে! আর আর্তনাদটা ছিল পুরুষ কণ্ঠের! কয়েক মুহূর্ত পর রুবেল দেখে পুরুষ অবয়বটা ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে আর নারী অবয়বটা উঠে দাঁড়িয়েছে! হাতে একটা বড় ধারালো কিছু যার কানা বেয়ে কিছু একটা চুইয়ে পড়ছে! রক্ত কি সেটা তবে?
এরপর হঠাৎ তাবুর ভেতরের আলোটা নিবে গেল! নিকষ অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা! হঠাৎ সেদিনের স্বপ্নে দেখা জিনিসটা দেখতে পেল রুবেল। অনেক দূরে অনেকগুলো লোক মিলে দুটো তিনটে মশাল জ্বালিয়ে একটা বড় মত বাক্স নিয়ে নিঃশব্দে কোথাও চলেছে! রুবেলের হঠাৎ করেই যেন সম্বিত ফিরে এল। সে জানে এরা কারা! সে জানে এরা কি

নিয়ে চলেছে! হ্যাঁ! এটাই তো কাল সারাদিন ধরে সার্চ করে সে বের করেছিল! স্বপ্নে দেখা সেই ঘটনাটা কি বাকার সাথে সম্পর্কিত! কিন্তু সে ভেবেছিল অতিরিক্ত ফিকশন আর থ্রিলার গল্পের কথা ভাবা আর পড়ার জন্য তার সাথে এরকম হচ্ছে! এ অসম্ভব! সে কি বাস্তবে আছে নাকি স্বপ্নে? রুবেলের মাথা ঘুরতে থাকে! "তুমি বাস্তবে আছো! আর ওরা তোমাকে চিনে ফেলেছে! ওরা এই রাস্তায় আসা কাউকেই আজ অব্দি জীবন্ত ছাড়েনি!" মাথা ঘোরাতেই দেখে সেই গেরুয়া বসন পড়া লোকটা! একদম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! "এসব কি হচ্ছে আমার সাথে? এ বাস্তব হতে পারেনা! অসম্ভব!" বলে আবারও ছুটতে চেষ্টা করে রুবেল! এবার ছুটতে পারে সে! কোন বাঁধন নেই আর! সামনের দিকে পাগলের মত ছুটতে গিয়ে হঠাৎ করে কিছু একটা ঠাণ্ডা জিনিসে তার পা ঠেকে! কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে টাল সামলাতে না পেরে ঝপ করে পড়ে যায়! "এখানে জল..." বরফ ঠাণ্ডা জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে বলতে থাকে রুবেল! জল থেকে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু পারেনা! কেউ যেন জলের তলা থেকে তার পা দুটোকে টেনে রেখেছে! জ্বর শরীর নিয়ে আর বেশিক্ষণ সেই

আসুরিক শক্তির সাথে আর পেরে উঠতে পারলনা রুবেল! পা সমেত তাকে সেই আসুরিক শক্তি সর্বশক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে চলল জলের তলায়! হিমশীতল জলের তলায় শেষবারের মত দমটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে রুবেল অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল তাকে! থুতনিতে সাদা দাঁড়ি আর তার ফাঁকে ক্রূর হাসি!
সেদিন রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়লো! অসম্ভব ঠাণ্ডা! ডাললেকের জলটা পুরোপুরি জমে গেল সেই এক রাতে! আর সেই বরফের তলার জলে কবর হয়ে গেল একজন, একজন উঠতি লেখক! নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, হারিয়ে গেল!

পর্ব ৬

“দ্যা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড ইস কারেন্টলি সুইচড অফ! প্লিস ট্রাই এগেন লেটার!” এই নিয়ে প্রায় পঞ্চাশবার ট্রাই করা হয়ে গেল পারভেজের! কিন্তু না! কোন উত্তর পাওয়া গেলনা! কি হল তবে রুবেলের? সে যত জরুরী কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, ফোন তো অফ রাখেনা! আজ প্রায় তিনদিন ধরে ট্রাই করে চলেছে সে রুবেলের ফোনে! কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই একই মেশিন জেনারেটেড ভয়েসে সেই একই কথা!

এবার খুব চিন্তা হতে লাগলো পারভেজের! “জান্নাত লজের ফোন নাম্বারটাও নিয়ে রাখা হয়নি! শিট!” নিজের মনেই কথাগুলো বলে মাথা চাপড়াতে থাকলো পারভেজ।

এইভাবে আরও চারদিন বেরিয়ে গেল। কিন্তু রুবেলের ফোনও লাগছিলনা আর রুবেলও নিজের থেকে কোন যোগাযোগ করছিল না পারভেজের সাথে! দুশ্চিন্তাটা এবার যেন অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছিল পারভেজের। অনেক ভেবেচিন্তে অফিসে একটা এক সপ্তাহের লিভ অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে ছুটি মঞ্জুর হতেই দিল্লি থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে পারভেজ। রাস্তায়ও বহুবার রুবেলের ফোন ট্রাই করতে থাকে সে! কিন্তু না! সেই একই জবাব প্রতিবার!

“ভাইজান, একটু শুনবেন?” পারভেজের ডাক শুনে একজন ফিরে তাকিয়ে বলল “বলুন মিয়াঁ!” পারভেজ একটু এগিয়ে এসে বলল “এই জান্নাত লজটা ঠিক কোনদিকে পড়বে একটু বলতে পারবেন?” লোকটা একবার পারভেজকে উপর থেকে নীচ অব্দি দেখে নিয়ে বলল “কোন জান্নাত লজ?ডাল লেকের সামনে যেটা?” পারভেজ উত্তেজিত হয়ে বলল “হ্যাঁ হ্যাঁ

ওইটাই হবে! আমার ছোটা ভাই বলেছিল লজটার একদম সামনেই লেকটা পড়ে!” লোকটা বলল “ওখানে কেন যাবেন এত লজ থাকতে?” পারভেজ কিছু একটা বলার আগেই লোকটার একটা ফোন এসে গেল। সে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারভেজ আর অপেক্ষা না করে চায়ের দোকানে টাকাটা মিটিয়ে বেরিয়ে এল। “ভাইজান? ডাল লেকটা এখান থেকে কতদূর পড়বে?” রাস্তায় একজনকে পারভেজ জিজ্ঞেস করলো। “বেশিদূর না মিয়াঁ! পায়ে হেঁটে পন্দ্রা মিনিট মত লাগবে!” জবাব শুনে সুক্রিয়া জানিয়ে পারভেজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

“হ্যালো কেউ আছেন? কি ব্যাপার! এই লজটা বন্ধ কেন? হ্যালো?” জংগ ধরা মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো পারভেজ। লজটার আশেপাশে বেশ কিছুটা দূরত্বে অন্যান্য বাড়িঘর, লজগুলো আছে! “কাউকে তো জিজ্ঞেস করতেই হবে! “ বলে সামনের গলিটা ধরে বেরোতে যাওয়ার সময়ে একজনের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় পারভেজের। কোন ভূমিকা না নিয়েই বলে ওঠে পারভেজ “ভাইজান, এইটাই জান্নাত লজ তো?” বলে আঙ্গুল তুলে পিছনের

লজটার দিকে দেখায়! লোকটা অসম্ভব বিস্ময়ে বলে ওঠে "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন?" "আসলে এই লজেই আমার ভাই এসে উঠেছে প্রায় ২০ দিন মত হল! কিন্তু দেখছি লজটা তো বন্ধ..." পারভেজকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে লোকটা আরও অবাক হয়ে বলল "দাঁড়ান দাঁড়ান মিয়াঁ! কি বললেন এখনি আপনি? আপনার ভাই এই লজে ২০ দিন আগে এসে উঠেছে? মিয়াঁ আপনি ভুল শুনেছেন হয়তো! অন্য কোন লজে এসে উঠেছে হয়তো আপনার ভাই! একবার জিজ্ঞেস করে নিন ভাইকে!" পারভেজ বলল "আরে না না ভাইজান, এক সপ্তাহ আগেই কথা হল রুবেল মানে আমার ভাইয়ের সাথে! বলল যে জান্নাত লজেই উঠেছে এবারও! যদিও আমি এখানে প্রথমবার এলাম। আর কোন জান্নাত লজ আছে কি এই লেকের ধারে?" লোকটা মাথা নাড়িয়ে বলল "না! আর তো নেই! আপনি আপনার ভাইকে একবার ফোন করে জিজ্ঞেস করে নিন! হয়তো ভুল শুনেছেন!" পারভেজ অস্থির হয়ে বলল "না না, এতবার কথা হল ওর সাথে! ও জান্নাত লজেই এসে উঠেছে! আর তাছাড়া ওর ফোনও লাগছে না ৭ দিন ধরে!" লোকটা এবার কি মনে হতে পারভেজের হাতটা ধরে লজটার সামনে

নিয়ে এল। তারপর মেন গেটের তালাটার দিকে দেখিয়ে বলল "এই দেখুন মিয়াঁ! এখানে তালা মারা তার উপর সরকারি সিল! দেখেছেন? এই লজটা প্রায় দুবছর আগেই সিল হয়ে গেছিল! আপনার ভাই কিভাবে ২০ দিন আগে এই লজে এসে উঠতে পারে বলুন তো?" পারভেজ এবার তাকিয়ে দেখল সিল করা তালাটার দিকে! সত্যিই তো! এতক্ষণ তার নজরই পড়েনি এইদিকে! পারভেজ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা পারভেজের মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলল "মিয়াঁ, আপনি মনে হচ্ছে অনেকটা রাস্তা সফর করে এসেছেন! আমার বাড়ি পাশের গলিতেই! চাইলে একটু পানি খেয়ে আরাম করে পারেন!" পারভেজ কিছু না বলে লোকটার পিছু পিছু চলল।

"এই জান্নাত লজটা একসময় খুব নাম করেছিল! মুজিব মিয়াঁ আর ওর বেগম মিলে একদম একা হাতে ছোট্ট লজটাকে দারুণ সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছিল! সবই খুব ভাল চলছিল কিন্তু হঠাৎই একদিন কানে আসে যে লজের উপর তলা থেকে মাঝ রাতে কারুর চিৎকারের আওয়াজ শোনা যায়। এটা ওই লজে যারা গিয়ে উঠত তাদেরই মুখ থেকে শোনা গেছিল! এরপর যত দিন

যেতে থাকে তত এই রোজ রাতের চিৎকারের মাত্রা বাড়তে থাকে। বেশ কিছুদিন পর দেখি মুজিব আর ওনার বেগম মিলে মেয়ে জুবেদা আর ছেলে রেহানকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। অনেক লাগেজ ছিল, একটা বড় মত গাড়ি সম্ভবত ভাড়া করে যাচ্ছিল। আমার সাথে দেখা হয়ে যায় সেই সময়ে! আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম কোথায় যাচ্ছে কিন্তু মুজিব এড়িয়ে যায়। বলে "এই তো সায়েদার আম্মির বাড়িতে যাচ্ছি একটু!" গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে এক ঝলক দেখেছিলাম জুবেদাকে সেদিন। বেহুঁশ মত হয়ে সায়েদার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল! এবার আপনিই বলুন, কেউ সিজনে এত ভাল চলা বিসনেসকে রামিজের হাতে ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে কোথাও এমনি এমনি কি ঘুরতে যায়?" বলে থামল লোকটা। বিস্ময়ভাবটা কাটিয়ে পারভেজ জিজ্ঞেস করলো "এই রামিজ কে?" লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "রামিজ এই লজের কেয়ার টেকার ছিল, সায়েদা বেগমের দূর সম্পর্কের কোন এক ভাই বলে শুনেছিলাম।" "আচ্ছা! তারপর কি হল?" পারভেজ তাকাল লোকটার দিকে। "তারপর যে কি হল সেটা কেউই জানেনা। পরে শুনেছিলাম মুজিবের মেয়ে জুবেদাকে কোন জিনে ধরেছিল

সম্ভবত। আর তার উপায় বের করতেই সপরিবারে কোন মৌলবি সাহেবের কাছে গেছিল তারা!” লোকটার কথা শেষ হতেই পারভেজ বলল “তারপর? রামিজ তো এখানেই ছিল! সে কিছু বলেনি? আর এখন সে কোথায়?” “সেইদিন যেদিন মুজিব সপরিবারে লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে গেছিল তারপর তারা আর কেউই ফিরে আসেনি! মানে তাদের আর দেখা যায়নি! হ্যাঁ, রামিজ লজটা সামাল দিচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু একদিন রামিজও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় হঠাৎ করেই! আর তারপর প্রায় একমাস পর লেকের অন্য এক প্রান্তে তার লাশ পাওয়া যায়!” লোকটার কথাটা শেষ হতে অজান্তেই শিউরে ওঠে পারভেজ। তারপর বলে “কিন্তু রামিজ এইভাবে কি করে...” “জানিনা মিয়াঁ! পুলিশ এসেছিল! তদন্তও হয়েছিল! কিন্তু কিছুই জানা যায়নি! তখনই মুজিব আর তার পরিবারের অন্তর্ধানের ব্যাপারটাও সামনে আসে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত মনে হয় এইটুকুই জানতে পেরেছিল যে মুজিবদের শেষ লাদাকের কোন এক গ্রামে দেখা গেছিল। সবই লোকমুখে শোনা, বুঝতেই পারছ! অনেক কিছু উপায় করেও শুনেছিলাম পুলিশ মুজিবের পরিবারের অন্তর্ধান রহস্য কিম্বা রামিজের মৃত্যু রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেনি! আর বেশ কিছুদিন পর

লজটাকে সিল করে দেওয়া হয় সরকারি ভাবে! এই সব ঘটনা প্রায় দুবছর আগের! তবে এখানের স্থানীয় মানুষ জান্নাত লজটাকে ভৌতিক বলে মনে করে! অনেকেই এখনো সেই চিৎকার কিম্বা হাসির শব্দ কিম্বা কোন মেয়ের গুনগুন করে গান গাওয়ার শব্দ পেয়েছে, রাতে এমনকি দিনের বেলাতেও!" বলে থামল লোকটা। পারভেজ চুপ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল "ভাইজান, আমার খুব ভয় করছে! আমার এখনও পরিষ্কার মনে পড়ছে আমার ভাই রুবেল বলেছিল যে সে এবারও জান্নাত লজেই উঠেছে! তার সাথে কিছু..." লোকটা পারভেজকে শান্ত করতে করতে বলল "আপনি মিয়াঁ শান্ত হন! ভয়ের কিছু নেই! আপনি যদি ভাইয়ের সাথে একেবারেই যোগাযোগ করতে পারছেন না তাহলে আমার মনে হয় আপনার একবার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত! আল্লা না করুক হয়তো আপনার ভাই কোন অন্য মুসীবতে পড়েছে!" পারভেজ ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।

"কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা?" পুলিশের কথায় পারভেজ বলে " সাতদিন ধরে কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছেনা!" "ঠিক আছে! আপনার ভাইয়ের একটা ফটো

আর বাকি ডিটেলস গুলো দিয়ে দিন! কিছু জানা গেলে আপনাকে জানানো হবে। আপনার ফোন নাম্বারটাও লিখিয়ে দিয়ে যান!” পুলিশের কথায় নীরবে মাথা নাড়ে পারভেজ।

দুদিন পরঃ

“হ্যালো, মিঃ পারভেজ আহমেদ বলছেন?” ফোনটা তুলে পারভেজ বলল “হ্যাঁ বলছি, বলুন!” অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল “আপনি এখুনি একবার শ্রীনগর থানায় চলে আসুন!” “কেন স্যার? আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন নাকি?” পারভেজের কথার জবাবে অপরপ্রান্ত থেকে শোনা যায় “আপনি আসুন, এলেই বুঝতে পারবেন!” ফোনটা রেখে চুপ করে বসে রইল পারভেজ। কেন জানিনা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কিছু তো একটা খারাপ হতে চলেছে!
“আপনারা আমাকে মর্গে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? কিছু বলবেন প্লিস?” উত্তেজিত হয়ে বলে চলে পারভেজ। দুজন কনস্টেবলের একজন বলে “দুদিন আগে লেকের ধার থেকে একটা লাশ পাওয়া গেছিল। শনাক্ত করা যাচ্ছিল না! দুদিন আগে আপনার দেওয়া বর্ণনা আর

ছবি অনুযায়ী আমরা খোঁজ শুরু করি আর সাথে মর্গের অশনাক্ত লাশগুলোর সাথেও মেলানো শুরু হয়! তো সেই লেকের পাশ থেকে পাওয়া লাশটার সাথে অনেকটাই মিল পাওয়া গেছে আপনার ভাইয়ের। লাশে পচন শুরু হয়ে গেছে তাই মুখ দেখে কতটা শনাক্ত করতে পারবেন জানিনা। তবে মৃত ব্যক্তির কিছু জিনিস পাওয়া গেছে সাথে যেমন শার্ট, প্ল্যান্ট ইত্যাদি। সেগুলোও একবার করে দেখে নেবেন আসুন।“ পারভেজের বুকের ভিতর যেন হাজারটা হাতুড়ি পেটাচ্ছিল কেউ। একটা রুমের মধ্যে তাকে সাথে নিয়ে ঢোকে তারা। তারপর একজন কম্পাউনডার এসে একটা সাদা চাদরে ঢাকা লাশের মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দেয়। পারভেজ বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ করেই ছুটে রুমের বাইরে বেরিয়ে আসে। হড়হড় করে বমি করে ফেলে সে।

“এই কিছু জিনিস পাওয়া গেছিল লাশের সাথে! এগুলো আপনার ভাই রুবেলের তাই তো?” অফিসারের হাত থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরা জামাপ্যান্ট গুলো কাঁপা কাঁপা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো পারভেজ। তার আর চিনতে ভুল হলনা যে

এগুলো তার ভাইয়েরই! তার এটাও বুঝতে বাকি রইলো না যে রুবেল আর এই দুনিয়ায় নেই।

“অফিসার, আমার ভাইয়ের মৃত্যু কিভাবে হয়েছে?” পরের দিন থানাতে এসে বলে পারভেজ। পুলিশ অফিসার আমির রহমান ইশারায় পারভেজকে বসতে বলেন। তারপর বলেন “আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি মিয়াঁ। ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট এখনও আসেনি! কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখতে চাই। এই নিয়ে গত দুবছরে লেকের পাশ থেকে ১০ নম্বর মৃতদেহ পাওয়া গেল। প্রতিবারই ময়না তদন্ত হয় কিন্তু অদ্ভুতভাবেই ময়না তদন্তের রিপোর্টে কিছু অস্বাভাবিক ধরাই পড়েনা। আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা জিনিস এই সবের মাঝে আছে যেটা ঠিক নেই! কিন্তু এর কিনারা করে উঠতে পারছিনা।“ পারভেজ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল “আমি সেসব জানিনা অফিসার! আমার ভাইয়ের মৃত্যুর কিনারা করতেই হবে! উঠতি লেখক ছিল সে, লেখা পাগল ছিল আমার ভাই! লেখালিখির জন্য প্রায়ই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতো! এবারের উপন্যাসটার জন্য কাশ্মীরকেই বেছে নিয়েছিল সে, যদিও এখানে আসা

যাওয়া লেগেই থাকতো তার! কিন্তু এবার মনস্থির করেই ফেলেছিল যে এমন কিছু একটা সৃষ্টি করবে সে যা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হবে কিন্তু তা মানুষকে ভাবাবে যে এরকমও হয়? কাশ্মীরেই সেই রসদ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল তার! তাই এখানে এসেছিল, জান্নাত লজে উঠেছিল, আর সে কথা আমাকে ফোনে জানিয়েওছিল। আর এখন শুনছি এই জান্নাত লজটা নাকি দুবছর আগেই সিল হয়ে গেছে! এটা কিভাবে সম্ভব অফিসার? আমার ভাই আমাকে মিথ্যা কথা কেন বলবে বলুন তো" পারভেজের কথা শেষ হতেই বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেন অফিসার আমির "কি বললেন? আপনার ভাইও জান্নাত লজে উঠেছে বলে বলেছিল আপনাকে?" পারভেজ অবাক হয়ে বলে "আমার ভাইও মানে?" অফিসার আমির বলেন "মানে আগের ৯টা কেসেও ভিকটিমরা প্রত্যেকেই বাড়ির কাউকে কিম্বা বন্ধুদের এটাই জানিয়েছিল যে তারা জান্নাত লজে এসে উঠেছে! আর প্রতি ক্ষেত্রেই তারা একাই এসেছিলেন কাশ্মীরে বিভিন্ন কাজে! অথচ এই জান্নাত লজটা আজ থেকে দুবছর আগেই সিল হয়ে গেছিল যখন লজের কেয়ার টেকারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কোইন্সিডেনটলি তারও লাশ

লেকের পাশ থেকেই পাওয়া গেছিল নিখোঁজ হওয়ার বহুদিন পর! কি যেন নাম ছিল...” “রামিজ?” পারভেজ হঠাৎ বলে উঠলো। অফিসার আমির বললেন “হ্যাঁ হ্যাঁ রামিজ ঠিক! এই রামিজের মৃত্যুর পর থেকেই এই লাশ পাওয়া শুরু হয়! তা আপনি কিভাবে জানলেন তার নাম?” অফিসারের প্রশ্নে পারভেজ জান্নাত লজের সামনে দেখা হওয়া লোকটার থেকে জানতে পারা সব কিছু খুলে বলল তাকে। সব কিছু শুনে অফিসার আমির বললেন “আমি এসব জিন টিনে বিশ্বাস করিনা তবে এই লজের মালিক ও তার পুরো পরিবারকে সত্যিই ট্রেস করা যায়নি। লাদাকে শেষ দেখা গেছিল তারপর যেন সপরিবারে কোথাও গায়েবই হয়ে গেছে!” পারভেজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল “অফিসার আমি চাই আমার ভাইয়ের মৃত্যুর কিনারা হোক!” অফিসার আমির বললেন “আগে ময়না তদন্তের রিপোর্টটা তো আসতে দিন মিয়াঁ!” পারভেজ বলল “আমি সেই অব্দি অপেক্ষা করতে পারবনা অফিসার! আমি দরকার পড়লে নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর রহস্য নিজেই খুঁজে বের করবো। আপনার কাছে এটা হয়তো একটা কেস শুধুই! কিন্তু আমার কাছে এটা আমার এক অঙ্গের বাদ চলে যাওয়ার সমান, কিম্বা তারও বেশি কিছু। আমরা দুই

মা-বাপ মরা ভাই, রুবেল ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই আমার! আমার রূহকে এইভাবে যে বা যারা কেড়ে নিল আমার থেকে তাকে খুঁজে বের করে একটাই সওয়াল করতে চাই আমি "কেন? কেন সে কেড়ে নিল রুবেলকে! কি দোষ ছিল তার?"" অফিসার বললেন "মিয়াঁ আপনি শান্ত হন! বেওয়াকুফি করবেন না! আমরা আছি কেসের তদন্তের জন্য! আপনি নিজে কেন সেধে বিপদে পড়তে যাবেন! ভরসা রাখুন আমাদের উপর!" পারভেজ আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল থানা থেকে।

এইভাবে আরও দুদিন গেল। রুবেলের বডি পারভেজকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখনও অব্দি ময়না তদন্তের রিপোর্ট কেন এল না! ইসলাম মতে রুবেলের দেহকে সমাধিস্থ করা হল শ্রীনগরেই! রুবেলের কবরে মাটি দেওয়ার সময় পারভেজ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলনা। হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। আশেপাশের লোকজন তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এল।

হোটেলের রুমে ফিরে পারভেজ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কান্নাটা এখনও দলা পাকিয়ে বেরিয়ে

আসতে চাইছে যেন! বেশ কিছুক্ষণ পর নিজের ফোনটা নিয়ে অফিসে একটা কল করলো "আমার ছুটিটা বাড়াতে হবে যেমন করেই হোক! আমি কিছু জানিনা! আমার ভাই রুবেল আর নেই! তুমি দেখো কিভবে কি করা যায়! রাখছি আমি!" বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে নিজের লাগেজ গোছাতে শুরু করলো পারভেজ। হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে এল সে। তারপর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল।"ভাইজান, আমি লাদাকে যাবো রিসার্ভ করে, যাবেন?" পারভেজের কথা শুনে ক্যাবের লোকটা বলল "কেন যাবনা মিয়াঁ! আসুন বসুন!" বলে ক্যাবের দরজাটা খুলে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করলো। গন্তব্য লেহ!

পর্ব ৭ (শেষ পর্ব)

"হ্যালো মিঃ পারভেজ? আপনি কোথায় আছেন এই মুহূর্তে?" ফোনের অপরপ্রান্তে অফিসার আমিরের গলা পেল পারভেজ। একটু কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলল "আমি এই মুহূর্তে লেহতে আছি অফিসার!" "আপনি কার পারমিশনে শ্রীনগর ছেড়ে বেরোলেন? আপনাকে আমি বলেছিলাম তো যে আপনার ভাইয়ের কেসটার তদন্ত চলছে! তার পরেও আপনি..." অফিসার

আমিরের কথা শেষ হওয়ার আগেই পারভেজ বলে ওঠে "আমার ভাইয়ের ইন্তেকালের পর তাকে সমাধিস্থ পর্যন্ত করা হয়ে গেল! আর আপনারা কি এখনও ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাননি? হয়তো আগের ৯টা কেসের মতই এটাতেও কোন সলিউশন বেরোইনি বলে দেবেন! কিন্তু আমি সেটা মানবোনা!" "দেখুন মিঃ পারভেজ, আমরা আমাদের কাজ করছি!" অফিসারের আমিরের কথার প্রত্যুত্তরে পারভেজ বলে "ঠিক আছে অফিসার করুন! আর প্লিস আমাকেও আমার কাজ করতে দিন! রাখলাম।" বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল পারভেজ।

"গ্রামের নামটা তো এটাই বলছিলেন অফিসার আমির! মাথু গ্রাম! কিন্তু এবার কিভাবে শুরু করবো! আমাকে আগে এই জান্নাত লজের ব্যাপারে সব কিছু জানতে হবে। আর সে ব্যাপারে সব কিছু জানতে গেলে জান্নাত লজের মালিক আর তার পরিবারকে খুঁজে বের করতে হবে! কিন্তু কিভাবে! আমার কাছে তো তাদের কোন ছবিও নেই!...আচ্ছা! রুবেলের কাছে তো নিশ্চয়ই ছিল ওদের কারুর ছবি! এতবার রুবেল এখানে এসেছে, আর প্রতিবার জান্নাত লজেই থেকেছে!..." নিজের মনেই এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কি মনে হতে নিজের ফোনটা বের করে একটা নাম্বারে কল করে

পারভেজ। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ফোনটা রিসিভড হয় "বলুন মিঃ পারভেজ!" "হ্যাঁ, অফিসার আপনাকে ফোন করলাম একটা জিনিস জানতে!" পারভেজের কথায় অফিসার আমির বলেন "কি জিনিস?" "বলছি আমার ভাইয়ের...ব...ডির মানে লাশের সাথে কোন ফোন কিম্বা আর কিছু পাওয়া যায়নি?" পারভেজের কথায় অফিসার আমির বলেন "না পাওয়া তো যায়নি কিন্তু তল্লাশি করা হচ্ছে! খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে কিছু না কিছু!" "ঠিক আছে রাখলাম অফিসার!" বলে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফোনটা রাখল পারভেজ। "রুবেলের ফোন কিম্বা ল্যাপটপটা পাওয়া গেলে অনেক কিছুই জানা যেত! কিন্তু এই পুলিশ কোনই কাজের না! কিন্তু রুবেলের জিনিসগুলো গেলই বা কোথায়?" অস্ফুটে এসব কথা নিজের মনেই বলে মাথা চাপড়াতে থাকে পারভেজ।

মাথু গ্রামটা লেহতে অবস্থিত একটা সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম! দূরে যতদূর চোখ যায়, শুধুই পাহাড়ের সারি! নীলাভ সাদা পাহাড়ের সারিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানুষ নিজের দুঃখের কথাও কি ভাবতে ভুলে যেতে পারে? হয়তো না!

একটা ছোট্ট কটেজের মত লজে এসে উঠেছে পারভেজ। কাল বিকেলে এসে পৌঁছেছিল। অতটা সফর করে মানসিক আর শারীরিক উভয় দিক থেকেই বেশ ক্লান্ত ছিল সে! তাই ঘুমিয়ে গেছিল অল্প একটু খাওয়া দাওয়া করেই! আজ সকালে তাই বেশ তাড়াতাড়িই ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার! প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কিন্তু তাও কি অসম্ভব মনোরম লাগছে বাইরেটা! পারভেজ শালটা গায়ে ভালভাবে জড়িয়ে রাস্তায় নেমে এল আর মনে মনে ভাবতে লাগলো কিভাবে শুরু করবে এক অদেখা পরিবারের খোঁজ! বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা বড় মত পাথরের উপর গিয়ে বসলো পারভেজ। দিনের আলো এখনও ঠিক করে ফোটেনি কিন্তু দু একজন লোক ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে! এখানের বেশিরভাগই চাষবাস করে নয়তো পশুপালন করে। বেশ গরীব এরা! তার উপর লেহর এই দিকটাতে পর্যটকও সেইভাবে আসেনা এক দুজন ছাড়া! এসব দেখতে দেখতেই পারভেজের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। রুবেল বলেছিল “ভাইজান এবারের উপন্যাসটা সুপার হিট হলেই কিছুদিনের জন্য লাদাকের কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে নিশ্চিন্তে কদিন থেকে আসব!

তুমিও ছুটি নিয়ে নিও! দুজনে বেশ অজানা অনেক কিছু একসাথে খুঁজে বের করা যাবে! বলা যায়না, সেখান থেকে হয়তো আবারও আরেকটা গল্পের প্লটও পেয়ে গেলাম আমি...” দুজনে খুব হেসেছিল সেদিন। হয়তো এরকমই এক গ্রামে আসতে চেয়েছিল রুবেল! পারভেজ তো আজ আসতে পেরেছে লাদাকের এই অনামি গ্রামে! কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাকে আসতে হবে তা সে কোনদিনও স্বপ্নেও ভাবেনি! হঠাৎই এসবের মাঝে পারভেজের মনে পড়লো একটা খুব দরকারি কথা! রুবেলের একবার ল্যাপটপ খারাপ হয়ে গেছিল। তাই জরুরী মেলগুলো চেক করতে পারছিল না! তাই সেইসময় পারভেজের ল্যাপটপ থেকে অনেকবার নিজের মেলটা ব্যবহার করেছিল রুবেল! এটা মনে আসতেই প্রায় তড়িৎ গতিতে পাথরের উপর থেকে উঠে কটেজের দিকে এগিয়ে গেল পারভেজ। দিনের আলো ততক্ষণে ফুটে গেছে!

কটেজে ফিরে তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করে পারভেজ। ল্যাপটপটা খুলতে খুলতে বার বার আল্লাকে স্মরণ করছিল পারভেজ। তারপর ল্যাপটপে নেটটা কানেক্ট করেই মেলটা খুলল।

নিজের মেল আইডিটা লগ আউৎ করতে গিয়ে দেখল নিচে রুবেলের মেল আইডিটার পাশে সাইনড আউট দেখাচ্ছে না! এবার মনে মনে আবারও আল্লাকে স্মরণ করে রুবেলের মেল আইডিটাতে ডাইরেক্ট ক্লিক করলো সে। বেশ কিছুক্ষণ কারসারটা গোল গোল ঘোরার পর মেলটা খুলে গেল! পারভেজ উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠলো। রুবেল তারমানে তার মেলটাকে সাইন আউট করেনি কিম্বা ভুলে গেছিল হয়তো! আর পারভেজও সেইভাবে লক্ষ্য করেনি কারণ তার ল্যাপটপে তার নিজের মেলটাই খোলা থাকে, সাইন আউট করার দরকার পড়েনা! পারভেজ যেন এই রহস্যের কিনারায় পৌছাঁনোর প্রথম সিঁড়িটা খুঁজে পেয়ে গেছিল! সে রুবেলের মেলের ড্রাইভটাতে এবার ক্লিক করলো।

রুবেল অনেককিছুই নিজের ল্যাপটপে ছাড়াও মেলের ড্রাইভে সেভ করে রাখতো যাতে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে কোনভাবে ডিলিট হয়ে গেলেও মেলের ড্রাইভ থেকে সেইসব জরুরি তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। পারভেজ ভাবছিল হোক না হোক এবারেও কিছুনা কিছু তো নিশ্চিতভাবেই রুবেল নিজের মেলের ড্রাইভে সেভ করেছে যা তার প্রয়োজনে আসতে পারে!

ড্রাইভটা খুলতেই পারভেজ দেখে সেখানে বেশ কিছু পিডিএফ আর ওয়ার্ড ফাইল সেভ করে রাখা আছে। সেগুলো সে একদম রিসেন্ট তা বোঝা যাচ্ছে! স্ক্রল করে নিচের দিকে চেক করতে থাকলো সে এই আশায় যে যদি জান্নাত লজের মালিক কিম্বা তার পরিবারের কোন ছবি পাওয়া যায়! কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়লোনা তার! অগত্যা রিসেন্ট পিডিএফ আর ওয়ার্ড ফাইলগুলো ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করে নিজের ল্যাপটপের ডেস্কটপে রেখে দিয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করে রাখল পারভেজ! “এখন একটু এদিক ওদিক দেখি গিয়ে কিছু জানা যায় কিনা! রাতে এই ফাইলগুলো চেক করবো না হয়!” মনে মনে এইসব ভাবতে ভাবতে ফ্রেশ হয়ে কটেজ থেকে বেরিয়ে এল পারভেজ।

মাথু গ্রামটার একদম শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট মত বাজার আছে! আসলে বাজার না বলে সেটাকে কয়েকটা অস্থায়ী পশরার সমন্বয়ে তৈরি হাট বললেই ভাল হয়! পারভেজ ভাবল বাজারের দিকে বেশি লোকের দেখা মিলতে পারে! সেই ভেবে সেই বাজার তথা হাটের দিকেই এগিয়ে গেল।

“ভাইজান, আপনার বাড়ি কি এই মাথু গ্রামেই নাকি?”

হেসে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলো পারভেজ। "লোকটা নিজের সব্জির পশরা সাজাতে সাজাতে ভাঙ্গা হিন্দিতে বলল "হ্যাঁ, কেন বলুন তো? আর আপনাকে তো এই গ্রামে আগে কখনও দেখিনি! বেড়াতে এসেছেন নাকি?" পারভেজ মেকি হেসে বলল "না মানে আমি একটা কাজে এসেছি এখানে!" লোকটা এবার পারভেজের দিকে তাকিয়ে বলল "কি কাজে?" "আসলে আমি কাউকে খুঁজছি!" পারভেজের কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটা বলল "আপনিও কি পুলিশের লোক নাকি? একজন পুলিশের লোক মাঝে এখানে এসেছিল অনেকদিন আগে! কোন এক পরিবারকে খুঁজছিল! আপনিও কি তাদেরই খুঁজছেন নাকি?" লোকটার কথায় আশান্বিত হয়ে পারভেজ বলে "হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও এক পরিবারকেই খুঁজছি! এই গ্রামেই তাদের শেষবারের মত দেখা গেছিল! আপনি কিছু জানেন তাদের ব্যাপারে? দুই ছেলে মেয়ে আর মিয়াঁ বিবি ছিল!" লোকটা বলল "দেখুন ভায়া, আমি আপনার আগে যে পুলিশের চর এসেছিল তাকেও বলেছিলাম আপনাকেও বলছি একই কথা, এরকম একটা পরিবার এখানে এসে তো ছিল। তবে মাথু গ্রামেই ছিল কিনা জানিনা!" পারভেজ অবাক হয়ে বলল "মানে? এখানে ছিলনা তো

দেখলেন কিভাবে তাদের?" লোকটা বলল "আমাদের মাথু গ্রামের একদম অন্যপ্রান্তে একজন সিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন। উনি বহু দেশ ঘুরেছেন এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী! ওনার কাছে তাই অনেক দূর থেকে বহু মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে আসেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে! উনি মনে করেন উনি কোন ধর্মের আওতায় পড়েন না! সব ধর্মই এক ওনার কাছে!" পারভেজের বেশ অবাক লাগছিল এটা ভেবে যে মুজিব আর তার পরিবার কোন মৌলবি সাহেবের কাছে না গিয়ে কেন এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে এসেছিল! অবশ্যই সেটা যে জুবেদার জন্যই এসেছিল সেটা আর বুঝতে বাকি রইল না পারভেজের! ভাবনা থামিয়ে পারভেজ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো "ভাইজান আর একটু সাহায্য করে দিন! এই সিদ্ধ ভিক্ষু বাবা ঠিক কোন দিকটাতে থাকেন একটু বলে দেবেন?" পারভেজের কথা শুনে লোকটা তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিল।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বাড়িটা যেরকম হবে বলে ভেবেছিল পারভেজ, সেরকম কিন্তু নয়! কোন কুটিরের মত ঘর হবে ভেবেছিল কিন্তু সামনে দোতালা বৌদ্ধ স্টাইলে

তৈরি একটা পাকা বাড়ি। আর তার চারপাশে বেশ কিছু গাছপালা! এমনিতেও মাথু গ্রামটা ফাঁকা ফাঁকাই! কিন্তু এই জায়গাটা যেন একটু বেশিই নিস্তব্ধ আর শান্ত! আস্তে আস্তে সদর দরজার কাছে এগিয়ে যায় পারভেজ। তারপর দরজায় একটা টোকা দেয়। বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়া না পাওয়াতে আবার টোকা দিতে যাচ্ছিলই তখনই ভেতর থেকে দরজা খোলার আওয়াজ এল। দরজা খুলতেই একজন অল্প বয়সী মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত বালককে দেখতে পেল পারভেজ। সে মুখে কিছু না বলে প্রশ্নসূচকভাবে তাকিয়ে রইল পারভেজের দিকে। পারভেজ আমতা আমতা করে বলল "ভিক্ষু বাবার সাথে দেখা করতে চাই! অনেক দূর থেকে এসেছি!" ছেলেটা কোন জবাব না দিয়ে ইশারায় পারভেজকে ভেতরে আসতে বলল। তারপর খুব নিচু গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলল "আপনি বসুন আমি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করে এসে বলছি আপনাকে!"

ঘরটা বেশ বড়। ঘরের একদম শেষপ্রান্তে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যানরত অবস্থায় বসে রয়েছেন। চারিদিকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ ছেয়ে আছে! এক অদ্ভুত শান্তি অনুভূত হচ্ছিল পারভেজের! অল্পবয়সী ছেলেটা ইশারায় পারভেজকে সন্ন্যাসীর কাছে যেতে বলল।

পারভেজ এগিয়ে চলল তাঁর দিকে।
“বল বেটা! কিভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি আমি?” মৃদু হাসি হেসে বললেন সন্ন্যাসী। পারভেজ একটু ধাতস্থ হয়ে বলল “বাবা আমি কিছু জানতে এসেছি আপনার কাছে! কারুর ব্যাপারে!” সন্ন্যাসী সেই মৃদু হাস্যমুখে ইশারায় পারভেজকে বলতে বললেন। পারভেজ তারপর সবকিছু খুলে বলতে শুরু করলো। যা যা অস্বাভাবিক জিনিস হয়েছে সবকিছু, জান্নাত লজের মালিক ও তার পরিবারের অন্তর্ধান, রামিজের মৃত্যু, সাথে তার ভাই রুবেলের মৃত্যু, সবকিছু খুলে বলে সে! সবকিছু শুনে সন্ন্যাসী বাবা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলা শুরু করেন “বেটা তুমি তো ইসলামি! তুমি নিশ্চয়ই জন্মান্তরে বিশ্বাস করোনা?” পারভেজ মাথা নাড়িয়ে বলল “কোরান জন্মান্তর মানেনা! তাই...” পারভেজের কথা শেষ হওয়ার আগেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন “মুজিব আর তার স্ত্রী সায়েদা আমার কাছে এসেছিল প্রায় বছর দুই আগে! সাথে মেয়ে জুবেদা আর ছেলে রেহানও ছিল! মূলত জুবেদার জন্যই এসেছিল তারা! অনেক মসজিদ, পিরবাবা, মৌলবি, সন্ন্যাসীদের কাছে ঘুরেও

কিছু লাভ হয়নি তাদের! তাই না জানি কিভাবে জেনে এতদূরে আমার কাছে এসেছিল! জুবেদার এমনিতে কিছুই অসুবিধা ছিলনা! কিন্তু রাত হলেই সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত! সেই স্বপ্ন তাকে রাতের পর রাত ঘুমোতে দিতনা! এরপর জুবেদার ১৬তম জন্মদিনের পর থেকে সে যেন কেমন বদলে যায়! লম্বা ঢোলা হানফু টাইপের জামাকাপড় পড়ার জন্য জেদ করতে থাকে! চাইনিস খাওয়ার ছাড়া খাবেনা, এরকমও অস্বাভাবিক আচরণ সামনে আসতে থাকে! মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে এক দুর্বোধ্য ভাষায় গান গেয়ে বেড়াতো জুবেদা তারপর কিছু একটা দেখে চিৎকার করে জ্ঞান হারাতো! মানে এতদিন যা তার স্বপ্নে আসতো সেটা আস্তে আস্তে তার স্বত্বাকে কাবু করতে থাকে! যত দিন যাচ্ছিল জুবেদার মধ্যে ততই যেন পরিবর্তন আসছিল। অবশেষে একদিন সে নমাজ পড়তে অস্বীকার করে! আর নিজেকে ইসলামি বলতেও অস্বীকৃত হয়! আমি এইসব কথা শুধুমাত্র জুবেদার মা-বাবার কাছে শুনেই বলছিনা বরং তাদের আমি আমার বাড়িতে দুদিন থাকতে বলি আর জুবেদাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করি দিনে এবং বিশেষ করে রাতে! সবটা দেখে অনেকেই হয়তো ভাববে যে জুবেদা মানসিক রোগী কিম্বা অন্যকিছু! কিন্তু আমি

এরপর আমার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারি যে জুবেদা আসলে মানসিক রোগী নয়! এ এক অদ্ভুত জিনিস! এ কোন জিনও নয় আবার কোন আত্মাও নয়! এ হল এক পিশাচ! এক বহু হাজার বছর পুরনো পিশাচ যে কিনা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এত হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করেছিল যে কবে সেই মেয়েটা আবার জন্ম নেবে! আর সে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবে! এই পিশাচী আত্মাটা যার সে কোনদিন হারকে মেনে নিতে পারেনি নিজের জীবন দশায়! কিন্তু মৃত্যুর কাছে সবাইকে এক না একদিন হেরে যেতেই হয় সে যত বড়ই বিজয়ী হোকনা কেন! মৃত্যু আর ভবিতব্য কেউই পাল্টাতে পারেনা!" একটু থামলেন সন্ন্যাসী। পারভেজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে দেখে তিনি আবারও বললেন " আমি জানি তুমি জন্মান্তর কিম্বা অপদেবতাতে বিশ্বাসী নও! আমি বিশ্বাস করতেও বলবো না! এক এক ধর্মাবলম্বীদের এক একরকম মান্যতা থাকে! কিন্তু আমি শুধুমাত্র অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী! হ্যাঁ, আমি দেবতাতেও বিশ্বাসী তেমনি অপদেবতাতেও বিশ্বাসী! রাত না হলে যেমন দিন আসেনা তেমনি অশুভ শক্তি আছে বলেই বারে বারে শুভ শক্তির আবির্ভাব

হয়ে এসেছে! আর জন্মান্তরের অনেক নমুনা আমি আমার অর্জিত অভিজ্ঞতায় পেয়ে এসেছি! আমি এর আগে আরও অনেক রকম পিশাচী শক্তির নিদর্শন পেয়েছি কিন্তু জুবেদার ব্যাপারটা সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার উপরে! আমি আগে কখনও এত শক্তিশালী, এত ভয়ংকর আর এত প্রলয়কারী পিশাচের সংস্পর্শে আসিনি! আমি আমার গুরুজির সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম! তিনিও তার জীবদ্দশায় এতটা অদ্ভুত কিছু শোনেননি! সবশেষে আমি আমার গুরুজির পরামর্শে মুজিব আর সায়েদাকে চীন দেশ পেরিয়ে মঙ্গোলিয়া আর রাশিয়ার সীমান্তে স্থিত একটা নদী ওননের তীরে গিয়ে কিছু বিধি করার কথা বলি! যদিও এই বিধি করতে শুধুই জুবেদার একা যাওয়াটাই উচিত ছিল কিন্তু এত ছোট মেয়ে তার উপর মানসিকভাবে দুর্বল তাই মুজিব আর সায়েদাকেও যেতে বলেছিলাম!”
“তারপর?” পারভেজের কথায় সন্ন্যাসী বলেন “ওরা সেইসময় মেয়ের জন্য সবকিছু করতে রাজি ছিল! তাই রাজি হয়ে যায়! সায়েদা, জুবেদা আর রেহান আমার বাড়িতে কদিন ছিল আর তার মাঝে মুজিব গেছিল পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা করতে! এরই মাঝে অনেকগুলো অদ্ভুত জিনিস হতে থাকে! হঠাৎ হঠাৎ

আমার বাড়িটা দুলে উঠত! একদিন আমি পাশের আখরোট গাছের তলায় বসে ধ্যান করছিলাম হঠাৎ মড়মড় করে একটা আওয়াজ আসে কানে! চকিতে আমি সেখান থেকে সরে না এলে গাছটা আমাকে পিষে দিত! রাতের বেলা অনেকরকম আওয়াজ আসতো, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, চিৎকারের আওয়াজ আরও কতকি! আর তখন জুবেদাকে সামলানো যেতনা একদমই! যাই হোক, সপ্তাহখানেক পর মুজিব ফিরে আসে! তারপর তারা সপরিবারে আমার এখান থেকেই মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়! কথা ছিল ১৫দিনের মধ্যে সব মিটিয়ে ফিরে আসবে! বিধির সবকিছু আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ওদের! ফিরে আমার সাথে দেখা করেও যাবে বলেছিল! কিন্তু আর আসেনি ওরা! আজ তোমার মুখে জানতে পারলাম যে ওরা আর ফেরেইনি বরং ওদের বাড়িটাকে ঘিরে এক মৃত্যুলীলা শুরু হয়ে গেছে! এসবই সেই পিশাচের কাজ! আমি ধ্যান করে আর আমার অভিজ্ঞতায় যেটুকু বুঝেছি সেটা হল সেই পিশাচী শক্তি চায়না যে কেউ তার এই প্রতিশোধের মাঝে আসুক কিম্বা তার ব্যাপারে কিছু জানুক! আমিও অনেকবার এরকম কিছু সাবধানী স্বপ্ন পেয়েছিলাম! তাই মন্ত্রপূত ধাগা দিয়ে আমার সারা বাড়িটা ঘেরা

আছে! কোন অশুভ শক্তি কিম্বা পিশাচ এই ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু করতে পারবেনা! কিন্তু তাও বাড়ি থেকে বেরোলেই আমার সাথে আজও কিছুনা কিছু হয়! আমার প্রাণ না নেওয়া অব্দি সেই পিশাচের শান্তি নেই!" "কিন্তু কেন বাবা? আর এই পিশাচী আত্মাটা কার?" পারভেজের কথায় সন্ন্যাসী বলেন "কার জানিনা! মানে জানতে দেয়নি সেই শক্তিশালী পিশাচ! তবে অনেক অনেক বছরের পুরনো এই শক্তি! তাই তার এত দাপট! কোন বিধ্বংসী মানুষের পিশাচী আত্মা হবে নিশ্চিতভাবে! এর সাথে লড়ার সামর্থ্য আমারও নেই, হয়তো কারুরই নেই! তবে আমাকে মেরে ফেলতে চায় কারণ আমি তার উদ্দেশ্যের অনেকটাই ধরে ফেলেছিলাম আর সে চায়না যে কেউ তার মৃত্যু পরবর্তী ব্যাপারে কিছু জানুক! হয়তো তোমার ভাইও কিছু জেনে গেছিল তাই..." পারভেজ একটু যেন চমকে উঠলো! নিজেকে সামলে নিয়ে বলল "ও! কিন্তু জুবেদার সাথে সেই পিশাচের কি শত্রুতা ছিল জানতে পেরেছিলেন?" পারভেজের কথায় সন্ন্যাসী বলেন "না! তবে সে জুবেদার প্রাণ না নেওয়া অব্দি থামবেনা সেটা বুঝতে পেরেছিলাম! জুবেদার সাথে পূর্বজন্মের কোন হিসাব ছিল তার, আর সেই হিসাব বরাবর করার

জন্যই এত হাজার বছর সেই পিশাচী শক্তি অপেক্ষা করেছে! তাই আমি আর আমার গুরুজি মিলে একত্রভাবে ধ্যান করে এর একটা উপায় বার করেছিলাম! সেটা হল জুবেদাকে যেতে হবে ঠিক সেই জায়গায় যেখানে সেই পিশাচী শক্তির মরদেহ দাফন করা আছে! ধ্যানবলে জানতে পারি সেই জায়গাটা মঙ্গোলিয়া আর রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি কোন এক নদীর নীচে! আমি বহু দেশ ঘুরেছি তাই সেইসব তথ্য ঘেঁটে বুঝতে পারি সেই নদীটি হল ওনন নদী! সেখানে গিয়ে জুবেদাকে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে নদীর জলে নিজের পাঁচ ফোঁটা রক্ত শরীরের যেকোনো অংশ থেকে ফেলতে হবে! তবেই সেই পিশাচ কিছুটা হলেও দুর্বল কিম্বা শান্ত হবে! সব কিছুই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আমি তাদের! কিন্তু জানিনা কি হয়েছে তারপর...কেনই বা তারা আর ফেরেনি!" "তবে কি তারা...?" পারভেজের কথায় সন্ন্যাসী বলেন "হয়তো তারা আর এই দুনিয়াতে নেই! সেই পিশাচ তার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছে! হয়তো না! " "তাহলে আমার ভাই রুবেল কিভাবে দুবছর আগে সিল হয়ে যাওয়া লজ আর দুবছর আগে হারিয়ে যাওয়া লোকেদের দেখতে পেল? তাদের সাথে রইল প্রায় ২০ দিন?" পারভেজের কথায় কিছুক্ষণ চুপ

থেকে সন্ন্যাসী বললেন “হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া পরিবারটা ন্যায় চাইছে! তারা চাইছে কেউ সেই পিশাচী শক্তির রহস্যটা সারা দুনিয়াকে জানাক! তাই তারা আজও সেখানে রয়েছে! হয়তো তোমার ভাইও আমার মতই অনেক কিছুই জেনে গেছিল তাই সেই পিশাচী শক্তি তাকে হত্যা করে, কারণ সেই পিশাচ অনেক বেশি শক্তিমান অন্যান্যদের থেকে! তবে আমার একটা কথা রাখো! আর এই ব্যাপারে কিছু জানার চেষ্টা করোনা! যতটুকু বুঝতে পারছি এই শক্তির সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়! তুমি অনেকটাই জেনে গেছো, এর বেশি জানলে তোমারও প্রাণ সংশয় হতে পারে! তোমার ভাইয়ের মৃত্যুতে আমিও ব্যথিত! কিন্তু এর কারণ আরও গভীরে গিয়ে জানার চেষ্টা ছেড়ে দাও! ফিরে যাও বেটা!” পারভেজ হতভম্বের মত বসে রইল সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে।

ভিক্ষুবাবার বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। জ্যাকেটের চেনটা ভালভাবে লাগিয়ে কটেজের পথে হাঁটতে হাঁটতে বারবার ভিক্ষু সন্ন্যাসীর একটা কথাই মনে আসছিল পারভেজের “হয়তো তোমার ভাইও এমন কিছু জেনে

গেছিল...”।

কটেজে ফিরেই ল্যাপটপটা খুলে বসলো পারভেজ। রুবেলের মেলের ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করা ফাইলগুলো এক এক করে খুলে দেখতে শুরু করলো। অনেকগুলো পিডিএফ আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যাপার নিয়ে! তারপর একটা ওয়ার্ডফাইলের দিকে নজর গেল পারভেজের! ফাইলটা “কবরবন্দি ইতিহাস”নামে সেভ করেছিল রুবেল।“তাহলে কি রুবেল নতুন উপন্যাস লেখা শুরু করে দিয়েছিল?” অস্ফুটে কথাটা বলে ফাইলটা খুলল পারভেজ। লেখাটা কিছুটা এরকম “স্বপ্ন! স্বপ্ন সবসময় যে অবাস্তব বিষয়ের উপর হয় তা কিন্তু নয়! কিছু স্বপ্নে কিছু ইঙ্গিত থাকে! ভবিতব্যের ইঙ্গিত! আমি রোজ রাতেই একটা স্বপ্ন দেখি! কিছু লোক মশাল হাতে তরবারি উঁচিয়ে কাউকে কবরবন্দি করে কোথাও নিঃশব্দে নিয়ে চলেছে! সেই রাস্তায় যদি কোন অযাচিত কেউ এসে পড়ছে তাহলে তাকে সেই মুহূর্তেই তরবারির কোপে মেরে ফেলা হচ্ছে! কি নিষ্ঠুর!এর পিছনে কারণ আছে! কারণটা হল কবরবন্দি হয়ে যে রয়েছে সে চায়না যে তার মৃত্যুর ব্যাপারে দুনিয়ার কোন মানুষ জানতে পারুক! তাহলে আমাকে কেন

দেখাল এই স্বপ্ন? তার উত্তর আমি খুঁজে চলেছি!" স্ক্রল করে আবার এক জায়গায় দেখে পারভেজ রুবেল লিখেছে "আমি আজ এর উত্তর পেলাম কেন সেই কবরবন্দি ইতিহাসের সাক্ষী আমি প্রতিরাতে হয়ে চলেছি! কারণ আমিই তার এই কবরবন্দি হওয়ার মূলে ছিলাম!" ব্যস এটাই শেষ লাইন। আর কিছু লিখে উঠতে পারেনি রুবেল হয়তো। কিন্তু এই "আমিটা কে? রুবেল কার জবানিতে লিখছিল এটা" মনে মনে ভেবে পারভেজ পর পর বাকি পিডিএফগুলো চেক করতে করতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল একটা নাম দেখে "ওনন নদী!" একটা কোন অজানা জার্নালিস্টের লেখা খুবই পুরনো একটা আর্টিকেল! লেখাটার বিষয়বস্তুটা ঠিক এরকম "দিগ্বিজয়ী বীর চেঙ্গিজ খাঁ তার জীবনের শেষের দিকে পৌঁছেও বিজয়ী হওয়ার লালসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি! পারস্য ক্যাম্প থেকে ফিরে ওনার পরবর্তী লক্ষ্য ছিল উত্তর পশ্চিম চিনকে নিজের দখলে আনা! যেমন ভাবা তেমন কাজ! ১২২৭ সালে উনি তখনকার উত্তর পশ্চিম চিনে রাজত্বকারী তাংগুট সাম্রাজ্যের রাজাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু রাজা রাজি না হওয়ায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়! চেঙ্গিজ খাঁর লক্ষ্য শুধু তাংগুট সাম্রাজ্যের পতনই ছিলনা

বরং তাংগুট রাজার সুন্দরী যুবতী মেয়ের দিকেও তার দৃষ্টি ছিল! যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে চেঙ্গিজ খাঁ রাজাকে প্রাণভিক্ষা দিতে চান কিন্তু তার জন্য শর্ত দেন যে তাকে নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিতে হবে! রাজা নিজের যুবতী সুন্দরী মেয়েকে এক ৬৫ বছরের বয়স্ক অত্যাচারী কুখ্যাত লোকের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে নিজে মৃত্যুটাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। তার কথায় অস্বীকৃত হওয়ার চরম ক্রোধে খাঁ রাজাকে হত্যা করেন। এরপরের দিন তাংগুট রাজকুমারীকে টেনে হিঁচড়ে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে আসার হুকুম দেন খাঁ। কিন্তু খাঁ হয়তো জানতেন না তার দিন ঘনিয়ে এসেছে! রাজকুমারী নিজের ঘন মোটা চুলের ভেতর একটা চাকু লুকিয়ে রেখেছিল! খাঁ তার সাথে জবরদস্তি করার চেষ্টা করতেই কায়েদা করে রাজকুমারী সেই তীক্ষ্ণ চাকু দিয়ে তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়! খাঁ আর এবার পেরে উঠতে পারেননি সেই যুবতি সাহসী নারীর কাছে! দিগ্বিজয়ী বীর চেঙ্গিজ খাঁ, যার নামে সারা এশিয়ার মানুষ ভয়ে থরথর করে কাঁপত সে কিনা শেষ অব্দি এক নারীর কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে! এ কি কম লজ্জার, কম অপমানের কথা? খাঁ তাই মরেও মরতে চাননি! রাজকুমারীকে খাঁর সৈন্যরা ধরার

আগেই সে কোনরকমে পালিয়ে যায়! কিন্তু বেশিদূর পালাতে না পেরে শেষ অব্দি হলুদ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে! কিন্তু খাঁর হত্যা করা হয়েছিল! আর খুনি ছিল সেই সাহসিনী রাজকুমারী। খাঁ শেষবারের মত পার্থিব দেহত্যাগের আগে নিজের লোকদের বলে গেছিলেন যে তার কবর যেন কেউ কোনদিন খুঁজে না পায়! তাকে এমন জায়গায় দাফন করা হয় যেন তা চাইলেও কেউ জানতে পারবেনা! তাই খাঁর কবর চুপিসারে চিন সীমান্ত পেরিয়ে মঙ্গোলিয়ার শেষ সীমান্তে এনে এক অজানা জায়গায় কোন চিহ্ন না রেখে দাফন করা হয়! আর দাফনের পর পাশের ওনন নদীর গতিপথ বদলে তার কবরের উপর দিয়ে বইয়ে দেওয়া হয়! দাফন হয়ে যায় চেঙ্গিজ খাঁ চিরতরের জন্য সেই ওনন নদীর তলায়!" এইটুকু পড়ে পারভেজ বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে! তারপর অস্ফুটেই বলে ওঠে "জুবেদাই কি তবে তাংগুট রাজকুমারীর পরবর্তী জন্ম? আর সেই পিশাচ কি তবে ইতিহাস কুখ্যাত চেঙ্গিস খাঁর রুহ?" হঠাতই খুব ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে পারভেজের! সম্বিত ফিরলে পারভেজ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে শুরু করে যে হঠাৎ এই ঠাণ্ডা কোথা থেকে ঢুকছে রুমে! জানলা

দরজা সব বন্ধ! হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হয়! পারভেজ চমকে ওঠে! তারপর কি মনে হতে রুমের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে! কটেজটা এমনিতেই খুব ছোট! তার উপর আবার অন্ধকার হয়ে আছে করিডরটা। মোবাইলে আলো জ্বালিয়ে কটেজের ছোট্ট রিসেপ্সনটা অব্দি এসে দেখে সদর দরজাটা খোলা আর বাইরের জোর হাওয়াতে সেটা বারবার ধাক্কা দিচ্ছে আর আওয়াজ করছে! পারভেজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজাটা বন্ধ করতে এগিয়ে আসে। তারপর কি মনে হতে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে! মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া থান গায়ে লোকটার মুখটা খুবই অস্পষ্ট কুয়াশার জন্য! লোকটা বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা মন্ত্র পড়ছে আর একটা অজানা সুগন্ধে চারদিক ম ম করছে! পারভেজ যেন চেয়েও চোখ ফেরাতে পারছেনা লোকটার দিক থেকে! বেশ কিছুক্ষণ পর লোকটা এবার চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো! তারপর পিছন ফিরে পারভেজের দিকে তাকিয়ে নিজের ডান হাতের তর্জনীটা দুদিকে হেলাল। তারপর আস্তে আস্তে কুয়াশার মাঝে হারিয়ে গেল!